

শারদীয়া ১৪২৯

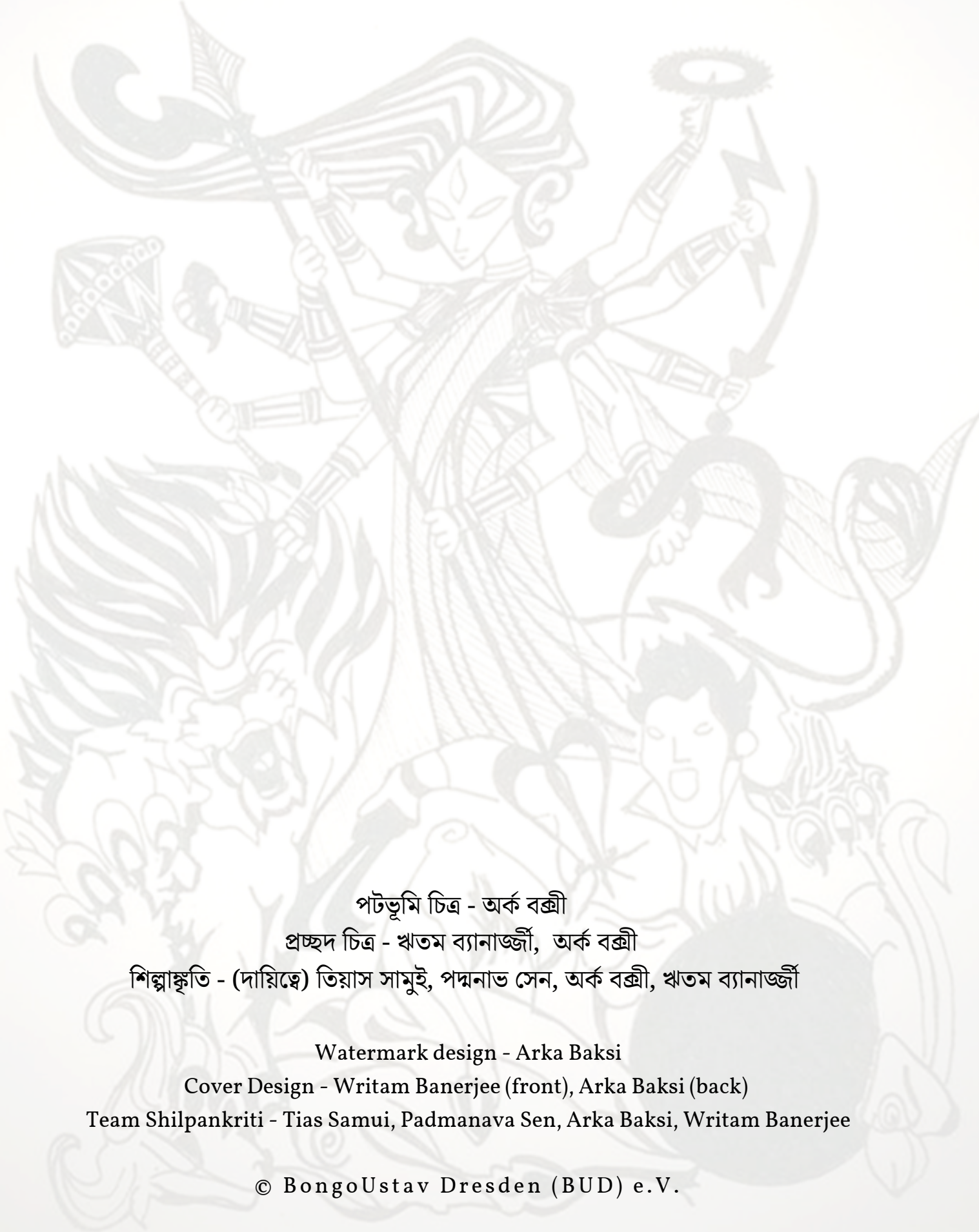
শিল্পাঙ্কতি

পূজাবার্ষিকী



**Annual Magazine
October 2022**





পটভূমি চিত্র - অর্ক বক্সী

প্রচ্ছদ চিত্র - ঋতম ব্যানার্জী, অর্ক বক্সী

শিল্পাঙ্কতি - (দায়িত্বে) তিয়াস সামুই, পদ্মনাভ সেন, অর্ক বক্সী, ঋতম ব্যানার্জী

Watermark design - Arka Baksi

Cover Design - Writam Banerjee (front), Arka Baksi (back)

Team Shilpankriti - Tias Samui, Padmanava Sen, Arka Baksi, Writam Banerjee

© BongoUstav Dresden (BUD) e.V.

I. Foreword from the President

With the advent of the colourful autumn, we all welcomed the arrival of Ma Durga in 2022. This year, for the fourth time, Durga Puja was celebrated in the beautiful city of Dresden, Saxony by the BongoUtsav Dresden (BUD) e.V for three days. The presence and wholehearted cooperation of all the members at every special moment against the backdrop of Bengali tradition provided us an immense sense of excitement, joy, and satisfaction. We would like to use this chance to express our sincere gratitude to the House of Resources, Dresden+ for taking an interest in our project and providing financial support for it. We truly hope that they will continue to assist us in the coming years.

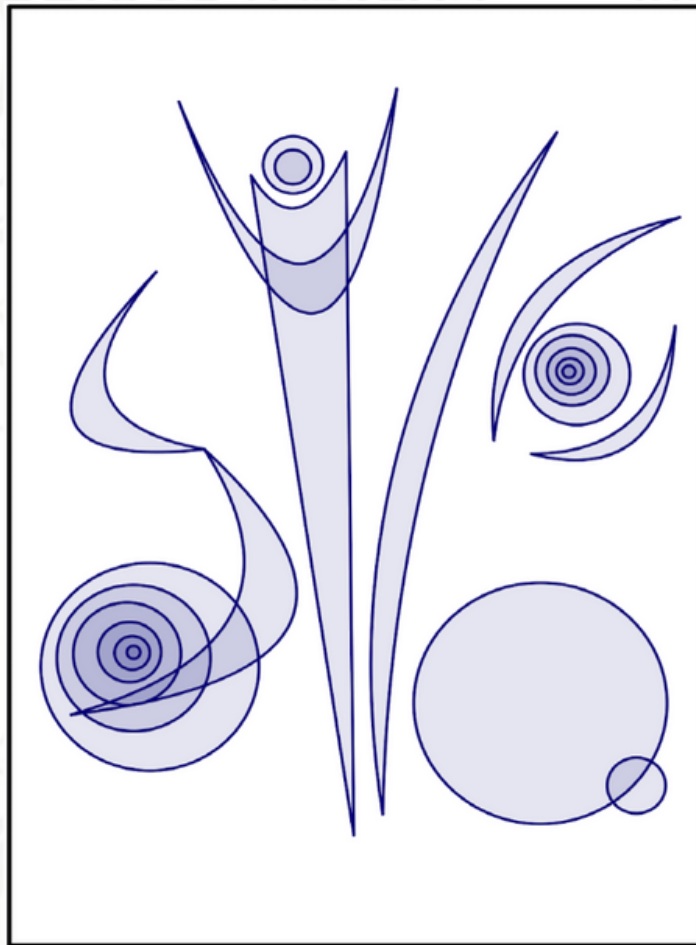
BongoUtsav Dresden (BUD) e.V. was officially formed in 2021, although we have been organising Durga Puja and other events since 2019. The organisation's main purpose is to raise awareness of the social and cultural heritage of Bengal in and around the city of Dresden. In the recent years, the city of Dresden has garnered lot of interest among the scientific and technological community and has become home for a throbbing population from both India and Bangladesh. BongoUtsav Dresden welcomes the people of Dresden and provides them with a creative platform to share and appreciate the knowledge of art and culture and enjoy our heritage, far away from our home.

With the inauguration of our first ever magazine Shilpankriti this year, we have achieved another milestone. I wholeheartedly thank all the contributors and especially our editorial team (Tias/Padmanava/Arka/Writam) who made it possible within a very short span of time. We genuinely hope to keep up this endeavour as it fosters creativity among all participants and rekindles our desire to engage in some creative activities. This moment also brings back precious memories of our childhood, when we would be similarly excited to ponder over the numerous Pujobarshikis (Annual Magazines commemorating the festive season) during our school days. Living abroad, our next generation does not get to experience the 'পুজো আসছে' or 'পয়লা বৈশাখে নতুন জামা' excitement or emotions. So hopefully through BUDs endeavours, we can recreate the magic of our culture for them one step at a time.

We don't want to be limited only by artistic and cultural endeavours; instead, we wish to spread our wings across the scientific community as well. In November, we plan to celebrate the World Science Day for Peace and Development along with the Birth anniversary of the eminent scientist, Sir. J. C Bose as our attempt to engage the wider community in debates on emerging scientific matters. The story of the young man who worked on the 60 GHz frequency in Calcutta in 1897 should be told to the youth of today's generation.

Despite the fact that COVID had limited our social life in the past two years, this year's summer was pleasant as we got to enjoy the “বাঙালী আড্ডা” along with cricket and potluck at the GroÙer Garten and few barbecue sessions on the banks of the River Elbe. We also celebrated “পয়লা বৈশাখ” and “রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা” with some outstanding singing performances from our members. Without our committee members' deep commitment, none of these celebrations would have been possible. This year, we also bid farewell to few members and truly thank them for everything they have done to help BUD succeed in the past years. While some of us will go and others will join, BongoUtsav Dresden will remain forever and forge an invisible tie that elevates our personal friendship to a new level and creates a family. I cordially invite everyone to join BongoUtsav Dresden and enjoy the Essence of Bengal in Dresden.

- Dr. Binit Syamal
President
BUD e.V.



Durga - Pranay Mandal

II. সাধারণ সম্পাদকের কলমে

জয়া বড়লোক বাড়ির মেয়ে। খুড়ি, বড়লোক বাড়ির মেয়ে ছিল। বিয়ের পর তার অবস্থা 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'- এর মতো না হলেও, আগের থেকে মন্দই বটে। বিয়েটা সে কিন্তু নিজের পছন্দমতই করেছিল। বলা বাহুল্য, বিয়েটা করেছিল বাড়ির অমতে। বিশেষত ওর বাবা কিছুতেই এই বিয়েতে রাজি হননি; এখনও জামাইকে ঠিক পছন্দ করেন না। জয়ার বর যে খুব সুন্দর দেখতে তা কিন্তু নয়, বড়লোক তো নয়ই। তা সত্ত্বেও জয়া যে কিসের টানে মহেশ্বরের প্রেমে পড়েছিল বা এখনো পড়ে আছে, তা ওই জানে। তবে সুখে দুঃখে তাদের দিন কেটে যাচ্ছে একরকম ভাবে।

মধ্যবিত্ত এই সংসারের মধ্যমণি হল জয়ার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় ছেলে গজানন বড়ই বুদ্ধিমান। মেজ মেয়ে কমলা শান্ত ও নম্র; ঘরের প্রতিটি কাজেই সে নিপুণ। সেজ মেয়ে জ্ঞানদা, পড়াশুনায় তুখোড় ও গান-বাজনায় পটু। জয়াকে বেগ পেতে হয় শুধুমাত্র তার ছোট ছেলেকে সামলাতে। এত কম বয়সে যে এত চঞ্চল ছেলেও হয়, তা ষড়ানগকে না দেখলে বোঝা যাবে না।


হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন, এই সংসারের গল্প আমাদের খুবই চেনা। তবে আমার এই শিব-দুর্গার গল্পে কিন্তু অসুরের স্থান নেই। নেই দাঁত কিড়মীর করা মহিষাসুরের অস্তিত্ব। আমার এই গল্পে যুদ্ধের কোন স্থান নেই, আছে শুধু হর-পার্বতীর ভালোবাসা ও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের ঘটনা।

সত্যি বলতে কি, খুবই বেগ পেতে হচ্ছে এইরকম একটি গল্প লিখতে। তার কারণ আমাদের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বহীন জীবন কল্পনা করা একরকম অকল্পনীয় শুধু নয়, একেবারে অবাস্তব। যুদ্ধ, হিংসা আর মারামারির ঘেরাটোপে ঘেরা আমরা সাধারণ মানুষেরা আর হাঁপিয়ে উঠি না। বরং ধর্মীয় মেরুকরণ, উগ্রপন্থা, অশিক্ষা - এইসব যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেমন মা দুর্গার সাথে মহিষাসুরের উপস্থিতিটাও যুক্তিসঙ্গত, আজকের পরিস্থিতিতে ভারত-পাকিস্তান, ইসরাইল-প্যালেস্টাইন, রাশিয়া-ইউক্রেন এর যুদ্ধ যেন মানানসই বলে মনে হয়। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমি এই গল্প লেখার চেষ্টা করছি, যেখানে জয়াকে আর যুদ্ধ করতে হবে না।

আসুন, আমরা সবাই এই গল্প লেখায় অংশগ্রহণ করি। এই ড্রেসডেনের বুকে আমরা গড়ে তুলি সম্প্রীতি আর ভালোবাসার ঐক্যতানে মোড়া একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে যেখানে জাতি-ধর্ম-দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা এই গুটিকয়েক বাঙালিরা সবাই মিলে এই বিশ্বদরবারের ছোট্ট শহরের বুক, চেষ্টা করি যাতে আদি পুরাতন 'ওম শান্তি:' এই মন্ত্রটি তার আক্ষরিক অর্থ খুঁজে পায়। আমরা হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পাব না। তবু চেষ্টা করলে নিষ্কাম কর্মের প্রেরণায় লেখা রবীন্দ্রনাথের পংক্তিগুলো হয়তো সত্যি করতে পারব - 'ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে -'। অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র তীরে হয়তো নয়, ড্রেসডেনের এলবে নদীর ঘাটের এই 'গঙ্গাতীরে' গড়ে উঠুক আমাদের বঙ্গ-উৎসব ড্রেসডেনের শান্তির কর্মযজ্ঞ। মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আমি যেন এই গল্প লিখে উঠতে পারি। চলুন, আমরা সবাই মিলে যেন যুদ্ধ-হিংসা-দ্বेष-দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে আরো অনেক সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

- ডা: প্রণয় মণ্ডল
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গ উৎসব ড্রেসডেন

Felicitation of the Outgoing Committee



প্রাক্তন কার্যনির্বাহী কমিটি - দীপিকা মল্লিক, অমিত দাস এবং সুজিত সরকারকে বঙ্গ উৎসব ড্রেসডেনের পক্ষ থেকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা

কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে
বন্ধু, রহো রহো সাথে

বিনীত শ্যামল প্রণয় মন্ডল জ্যোতির্ময় ইজারাদার
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ



Farewell to Dr. Amit Das, General Secretary



Farewell to Dr. Sujit Sikder, Treasurer



The Mother comes to Dresden - Arka Baksi

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব আপামর বঙ্গবাসীর মনের মনিকোঠায় সযত্নে পালিত এক জাগ প্রদীপ। তা সে ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশ-ই হোক বা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বিদেশে বিড়িয়ে। দেবী দুর্গাকে সপরিবারে বরণ করে নিতে আমরা, মানে সুদূর জার্মানির পূর্ব সীমান্তস্থিত ড্রেসডেনের বঙ্গবাসীরা তৎপর। বারোয়ারি থেকে সার্বজনীন হয়ে ওঠা এই মহোৎসবকে আক্ষরিক অর্থেই সার্বজনীন করার লক্ষ্যে আমাদের প্রথম প্রয়াস এবারের পূজো বার্ষিকী "শিল্পাঙ্কতি"।

ভৌগোলিক অবস্থানগত, সংস্কৃতিগত পার্থক্যে ভুলে এবারের পূজো বার্ষিকীতে স্থান পেয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলা, কবিতা, গল্প, ও আরো অনেক কিছু। বলতে কোন দ্বিধা নেই যে সকল গুণীজনের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ এবারের পূজো বার্ষিকী। আর লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিতও বটে।

১৪২৯ বঙ্গাব্দের ড্রেসডেনের শারদীয় সাহিত্যসম্ভার সার্বজনীনতার ছোঁয়ায় আঁপুল। কিন্তু এই আয়োজন প্রকৃত অর্থেই সার্থক হবে সকল পাঠকের গ্রহণ যোগ্যতায়।

For Bengalis all over the world, Durga Puja is an emotion that cannot be fully expressed in words. The Welsh word 'hiraeth', the feeling of an intense longing to return home, is probably what comes the closest. When going home becomes impossible, we do the next best thing - bring a slice of home to wherever we are.

Transcending divides and united by our mother-tongue, we the Bengalis living in Dresden started celebrating Durga Puja here to feel at home. This year we have gone a step further to bring to you the first edition of our annual magazine - Shilpankriti.

What started out as a humble effort to showcase the talent among us, soon took on a life of its own. We are overwhelmed with the response to our request for articles, poems, paintings and other entries for our magazine. We would sincerely like to thank each and every person who has contributed, for their valuable time and effort in making our dream a grand success.

Now we hand it over to you, the readers with the hope that we manage to light up your lives a bit more this festive season.

Dr. Writam Banerjee
Dr. Arka Baksi
Cultural Secretaries
BUD e.V.

সূচিপত্র



ভ্রমণ কাহিনী

নিশীথ সূর্যের দেশে
শুভ্রদীপ মণ্ডল
06

স্মৃতিতে ক্যাপ্রি
দোলা দাশগুপ্ত
11

Iceland Trip - A Travel
Diary
Shatabda Saha
17

টেনেরিফা দ্বীপে কিছুদিন
রাজীব সরকার
25

আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ-
দক্ষিণ কোরিয়া
পৌলমী চৌধুরী
36

তুষার স্থাপত্যের আঙ্কানে
ঋতম ব্যানার্জী
43

দুই ছবির উপাখ্যান
পদ্মনাভ সেন
45

দূর পাহাড়ের হাতছানি
সৌরভ দেব
48

ছোট গল্প

করোনার কবলে
প্রীতম রায়
01

The Fountain Pen
Aaryan Kannan
09

প্রশংসা
অরুণা রায়
29

পিংলার অদ্রুত স্বপ্ন
পাপিয়া দাস
38

অচেনা পাহাড় - চেনা
প্রিয়জন
পদ্মনাভ সেন
51

কবিতা

প্রবাসে উৎসবে
অনিন্দ্য মুখার্জী
15

শারদীয়া
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়
35

আজকে বিসর্জন
ঋতম ব্যানার্জী
47

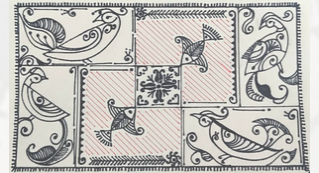
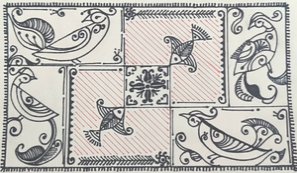
শুক্লো প্রেম
চন্দ্রাধিশ ঘোষ
54

শিল্পাকৃতি 'ইসম্পেসাল'

মনে বৃষ্টি
ঋতম ব্যানার্জী
13

একটি অন্য প্রেমের
গল্প
শূন্য
55

শব্দছক
অর্ক বক্রী
32



BUD e.V. sincerely thanks all its sponsors and partners



House of Resources Dresden+

House of Resources Dresden+ | Schweizer Straße 32 | 01069 Dresden
Telefon: 0351 40766253 E-Mail: info@hor-dresden.de



Telecast and Print Partners



বর্তমান

করোনার কবলে

প্রীতম রায়

সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা হয়েই চলেছে। অনেক অপেক্ষা করেও যখন দেখল থামার নাম নেই, বাবলু তার পেপ্লাই তিনচাকাটাকে রাস্তায় নামিয়েই ফেললো। রোজ সকালে সে গাড়ি নিয়ে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনএ যাত্রীদের অপেক্ষা করে। কিন্তু দিনকাল খারাপ। করোনার জন্য মেট্রো চলাচল বন্ধ। মেট্রো স্টেশনকে কেন্দ্র করে যে চার পাঁচটা রুট চলে তার সবকটার অবস্থাই সঙ্গিন। তারপরও গোধের ওপর বিষফোঁড়া এই আবহাওয়া। কয়েকদিন লোকে বাড়ির বাইরে বেরোতেও দু'বার ভাবছে। এই রোগটার নাম বাবলু সবার মুখে শুনেছে। বাদুড় না চামচিকা কি একটা থেকে ছড়িয়েছে। এখন তো মাস্ক, স্যানিটাইজার, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, কনটেনমেন্ট জোন এসব শব্দ যাত্রীদের মুখে শুনে শুনে কান পচে গেছে। বাজারের যা হাল, স্বয়ং ভগবান এসে গাড়ি চালালেও যাত্রী আসবে না। এই যাহ! ভগবান বলতে মনে পড়লো, রোজ সকালে কালীঠাকুরের ফটোটা গাড়িতে লাগিয়ে, মালা বুলিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে গাড়ি রাস্তায় নামায়। আজ বৃষ্টির চক্করে বেমালুম সব ভুলে মেরে দিয়েছে।

-কি রে, কি ভাবছিস? যাত্রী না এলে রাস্তা থেকে দুটো কুকুর উঠিয়ে গাড়িতে তোল। মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ পাবি। বলেই ফ্যাক করে দাঁত বের করে হাসলো বচু। বচুও বাবলুর রুটেই গাড়ি চালায়।

-যা আবহাওয়া, গলাটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে সকাল থেকে। তারপর আবার শুনছি সরকার নাকি সব দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছে। বসে বসে মাছি না তাড়িয়ে চল দুই ভাই মিলেই একটু গলা ভেজাই।

বাবলুরও কথাটা মন্দ বলে মনে হলো না। তবে তার ভাঁড়ে মা ভবানী। একটু ইতস্তত করছিল, বচু বুঝতে পেরে বললো,

- চল আমার স্টকে আছে কিছু, এক যাত্রী নেশার ঘোরে, ব্যাগ সমেত গাড়িতেই রেখে নেমে গেছিলো, টুক করে তুলে রেখেছি। কয়েকটা ভালো ব্রান্ডেরই বোতল হবে, আছে গাড়ির পেছনে।

- কিন্তু বচুদা, বেশি খাবো না, সন্ধ্যতে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

- কোন চিন্তা করিস না, আমি দু'বোতল শেষ করেও একহাতে গাড়ি চালিয়ে তোকে ঠিক তোর বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবো।

বচুর কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বাবলু বললো, তাহলে তুমি ওগুলো বের করে রাখো আমি ঘটিগরম, চানাচুর যা পাই নিয়ে আসি। বচুও ঈষৎ হেসে সায় দিলো।

এরপর বচুর গাড়িতেই বসে শুরু হলো পানপর্বা। পলিথিনের চাদর টানা গাড়িতে ওরা দুজন, আর বাইরে তখন ঝামাঝাম বৃষ্টি। প্রায় দেড় ঘন্টা পর বৃষ্টিটা একটু ধরে এল, কিন্তু আকাশ এখনো মেঘলা। হেমন্তকাল চলছে, কখন যে রূপ করে সন্ধ্য নেমে আসবে কে জানে! এদিকে বাবলুর মাথাটা ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে, আর বচু গাড়ির একটা কোণ বেছে নিয়ে তাতে মাথাটা সোঁটিয়ে অঘোরে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, যেন পুরো বিশ্ব ব্রহ্মান্দ গিলে নিয়ে আরাম করছে। এবার বাবলুকে একাই গাড়ি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে, আর উপায় নেই। আস্তে করে প্লাস্টিকের চাদরটা সরিয়ে সে বাইরে এল। আকাশে এখনো সূর্যাস্তের লাল আভাটা ছড়িয়ে আছে, বাবলু তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় অন্ধকার বেশ বেড়ে গেলো। হেডলাইট জ্বালিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে বাবলুর গাড়ি ছুটে লাগলো। রাস্তা পুরো শুনশান, এদিকে কেউ একটা আসে না। কাছেই একটা আবর্জনার পাহাড় আছে, খুব বিশ্রী গন্ধ ছড়ায়। লোকমুখে বাবলু শুনেছে এটা নাকি দুর্গন্ধের দিক থেকে ধাপার মাঠকে দশগোল দিতে পারে। খানিকটা এগোতেই গন্ধটা তীব্র হল, আর সেই সঙ্গে বাবলু তলপেটে চাপ অনুভব করল। না এখানেই থামতে হবে, এতো খাওয়া উচিত হয়নি। একরাশ বিরক্তি নিয়ে, গাড়িটা সাইড করে, একটা হাত দিয়ে নাক চেপে বাবলু হালকা হতে গেল।

কাজ সেরে ফিরে এসে, গাড়িতে বসে স্টার্ট দিতে গিয়ে বাবলুর বুকটা ছঁাত করে উঠলো। পেছনের সীটে একটা মেয়ে, বছর সতের কি আঠেরোর হবে, এসে বসেছে। অন্ধকারে ভালো করে মুখ দেখা যাচ্ছে না। আসলে তার গাড়িতে পেছনের দুটো সীটে, চারজন মুখোমুখি বসার জায়গা আছে, আর মাঝেরটায় তিনজনের। পেছনের ছোট দরজাটা পার হয়ে কখন যে মেয়েটা এসে বসেছে, বাবলু খেয়াল করতে পারেনি।

- বাড়ি ফেরত যাচ্ছি, এখন ভাড়া হবে না। বাবলু চৈঁচিয়ে বলল।

- আপনি যেদিকে যাচ্ছেন, সেদিকেই যাব। খুব দরকার পড়েছে, যমে মানুষে টানাটানি ব্যাপার! একটু নিয়ে চলুন না প্লিস।

বাবলু এমনিতেই এক কথার মানুষ, কিন্তু 'প্লিস' শব্দটায় বোধহয় কিছু আছে, আর তাছাড়া গলাটাও কেমন চেনা চেনা ঠেকছে।

লুকিং-গ্লাসে এবার ভালো করে দেখলো মেয়েটাকে, আড়াআড়ি বসার কারণে একপাশের মুখশ্রী বাবলুর নজরে আসছে। পরনে একটা হাতকাটা গেঞ্জি টাইপ, এটার নাম বাবলু জানতো, এখন অনেক চেষ্টা করেও ড্রেসটার নাম মনে করতে পারলো না। দেখেই খুব হাই প্রোফাইল কেউ মনে হচ্ছে, বাবলু বললো,

- দেড়শ টাকা লাগবে।

- দেবো, চলুন, মেয়েটা বললো।

এতক্ষনে বাবলু মেয়েটাকে চিনেছে, তার গাড়িতে করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যেত বছর দুয়েক আগে। তারপরও রাস্তায় কয়েকবার দেখেছে। একটা অচেনা ছেলের বাইকে করে যেতে। ইলেভেন এ উঠে খুব ডানা গজিয়েছিলো। তবে বেশ কিছুদিন নজরে আসেনি, আর এখানে এরম সময়ে দেখে বাবলু প্রথমে চিনতে পারেনি।

এতো বৃষ্টি বাদলার দিনে একা একা কোথায়, যাচ্ছে জানা দরকার। বাবলু জিজ্ঞেস করলো,

- কোথায় যাবে?

- বিন্ধবাসিনী নার্সিং হোম, উত্তর এলো।

- ফ্যামিলির কেউ ভর্তি আছে?

- না, বলে মেয়েটা একটু লাজুক ভঙ্গিতে হাসলো।

বাবলু ব্যাপারটা বুঝলো। সে আরেকটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সেই বাইক দাদাবাবু নাকি? একসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট কিছু? যা জোরে বাইক চালাতেন!

- না, একসিডেন্ট না। বড়োসড়ো একসিডেন্ট হলেও ঠিক ছিল, ও খুব ভালো গাড়ি চালায়, এরম কোনোদিন হতো না।

- আসলে তুমি বললে না যমে মানুষে টানাটানি, তাই ভাবলাম। বলেই বাবলু মনে মনে আবার চিন্তা করতে লাগলো মেয়েটা বলে কি? বয়ফ্রেন্ডের বড়োসড়ো একসিডেন্ট হলে ঠিক ছিল?

ব্রেকাপ হয়ে গেছে হয়তো, তাহলে আবার দেখতে যাচ্ছে কেন? এখান থেকেই বা কেন উঠলো? এইসব অজস্র চিন্তা বাবলুর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

খানিকদূর এগোতেই আবার বৃষ্টি শুরু হল। বাবলু এবার পড়লো মহা ফ্যাসাদে। নার্সিং হোমটা বেশ দূরে। নেশাটাও তীব্র হয়ে এসেছে। ঘুম পাচ্ছে খুব। কথা বলতে হবে ঘুম তাড়ানোর জন্য। তাই বাধ্য হয়ে শুরু করলো,

- তোমাকে তুমিই বলি, আসলে আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, তাই কথা বলছি। তোমার উত্তর দিতে ইচ্ছে না করলে দিও না, কেমন?

মেয়েটা সম্মতিসূচক ঘাড় দোলালো।

- তুমি যাকে, দেখতে যাচ্ছ সে কি জানে তুমি একা যাচ্ছ? আর হয়েছেই বা কি? তেমন কিছু সিরিয়াস হলে তার পরিবারের লোকেরা বুঝবে। কথাটা বলেই বাবলু বুঝলো, একটু অভিভাবকের মতন শোনাচ্ছে। কিন্তু নেশার পর এরম প্রবচন তার মুখ থেকে এমনিই বেড়িয়ে আসে।



The world's a stage and we all 'wear masks' - Poulami Chowdhury

- ওর করোনা হয়েছে, আর পরিবারের কেউ সেটা বুঝছে না, নার্সিং হোমে রেখে ব্রঙ্কাইটিস এর চিকিৎসা চলছে।

- তুমি কি করে জানলে এটা? চিকিৎসকরা আছেন তারাই বুঝবেন ভালো।

- আমি ছাড়া আর কে জানবে? আমার থেকেই তো

- তোমার থেকেই মানে? বাবলু মাস্ক খোঁজার জন্য হাতড়াতে লাগলো, পেলো না।

- ব্যস্ত হবেন না, আমি এখন ইমিউন।

- বেশ কয়েকমাস আগের কথা, লকডাউন শুরু হয়েছে, রাস্তায় বেরোলে পুলিশ বেদম পেটাচ্ছে। আমার খুব জ্বর এল, ভাবলাম, গঙ্গার ঘাটে বসে ঠান্ডা লেগেছে। আসলে ওর বাইকে করে গঙ্গার ঘাটে যেতাম রোজ। তারপর এক সপ্তাহ ঘরবন্দি, এই ওষুধ, সেই ওষুধ, কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছিলো না। খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলাম। রোজ ফোনে ওকে বলি। একদিন দুপুরবেলা বললো গঙ্গার ঘাটে দেখা করতে। পুলিশদের লাঠি অগ্রাহ্য করে শুধু আমায় দেখার জন্যই আসছে। আরো বললো যে জ্বরটর ওসব দেখা করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

এতটা বলে মেয়েটা একটু চুপ করলো। বাবলুরও ঘুম ছুটে গেছে। বাবলু ভাবছে গাড়িটাকে সানিটাইজ করতে হবে কাল সকালো। দেড়শো টাকার লোভে, শেষে না পাঁচশো টাকা বেড়িয়ে যায়। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বাবলু বললো, তারপর?

- তারপর আর কি? যা হয়, মাস্ক ছাড়া একটু মুখোমুখি বসে কথা বললাম, ও সরি, শুধু কথা না.....

বাবলু হাত দেখিয়ে থামতে বলে বললো,

- থাক, বুঝে গেছি। কিন্তু তুমি যেখান থেকে উঠলে ওখানে কেন এসেছিলে? তোমার বাড়ি তো উল্টো দিকে।

-হুম। আমার কথাটাই তো পুরো শেষ করতে দিলেন না আপনি। আমি তো সেদিন বাড়ি ফিরে দেখলাম পাড়ার ডাক্তারকাকু কাদের সব নিয়ে এসেছে। আমার আশেপাশে কেউ ঘেঁষছে না। বাবা,মা সবার চোখে জল! বাড়ি থেকে সোজা গেলাম কলকাতার এক নামকরা হাসপাতালে। বাড়ির লোকেদের কাউকেই আর দেখতে পেলাম না। চৌদ্দদিনের দিন দেখলাম, কয়েকটা লোক এলো পুরো আপাদমস্তক ঢাকা, আমাকে কালো প্লাস্টিকে মুড়ে ফেললো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ঘষতে ঘষতে নিচে নামালো।

বাবলু এতটা শুনে টোক গিলতে লাগলো, গাড়ি থামিয়ে দিল, হাত কাঁপছে। পিঠে একটা ঠান্ডা কনকনে স্প্রোত বইছে। আর শুনতেও ইচ্ছে করছে না। কি বলবে মেয়েটা অনেকটাই আন্দাজ করতে পারছে, আর সেজন্যই কাঁপুনিটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে মেয়েটা তখনও বলে চলেছে,

-আমায় এই আবর্জনার স্তুপটার কাছে এনে ফেললো, জানো? তারপর একটা কেরোসিনের শিশি থেকে কিছুটা আমার গায়ে ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলো, পুরোটা পুড়লামও না। লোকগুলো ওভাবেই ফেলে চলে গেলো। দেখো মুখের এইদিকটা কেমন জ্বলে গেছে পুরো। কালো পোড়া হাড়গুলো আর বলসে যাওয়া, বুলতে থাকা চামড়াগুলো দেখে বাবলু নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। হটাৎ মাংসপোড়ার বিশ্রী গন্ধে গাড়িটা ভরে উঠলো।

আঁক আঁক করে গোঙাতে গোঙাতে বাবলু জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পেল,

- আমি তঁ ওকেই নিঁতে এঁসেছি হিঃ হিঃ হিঃ।

পরদিন জ্ঞান ফিরলো সকালে, মুখে জলের ঝাপটাতে। বাবলু দেখে বচু তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখগুলো বড়োবড়ো করে বচু জিজ্ঞেস করলো,

- কাল বেশি খাওয়া হয়ে গেছিলো নাকি রে? বাড়ির থেকে এতো দূরে এই বিন্ধবাসিনী নার্সিং হোমের সামনে তোর গাড়ি দেখেই কেমন সন্দেহ হল। এসে দেখি এই অবস্থা।

- কিন্তু বচুদা, এতো সকালে তুমি এখানে? বাবলু জিজ্ঞেস করলো।

- এই দেখনা, একটা ডেডবডি নিয়ে যেতে ডেকেছে, তবে আমি না করে দিয়েছি। কানাঘুষো শুনছি ছেলেটা নাকি করোনায় মরেছে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

- বচুদা, প্লিস, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে আসবে করোনা ভূতের থেকে মানুষের হয় কিনা! বাবলু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো।

- নেশাটা তোর সহ্য হয়নি কাল, আজও ঘোর কাটেনি তোর, চল বাড়ি চল। জ্বর আসছে মনে হচ্ছে।

বাবলু নিজের বুক হাত দিয়ে দেখলো হৃৎপিণ্ডটা ভয়ঙ্কর লাফালাফি করছে। আরে! বুকপকেটে এটা কি? বাবলু দেখলো, একটা ভাঁজ করা একশ আর আরেকটা নতুন পঞ্চাশ টাকার নোট উঁকি দিচ্ছে!



'On our heads be it!' - Poulami Chowdhury

নিশীথ সূর্যের দেশে

শুভ্রদীপ মণ্ডল

দেশ ভেদে মাটি ভেদে জল-হাওয়া বদলে যায়; বদলে যায় আকাশের রঙ। স্বভাবত আমরা গ্রীষ্ম বলতে যা সচরাচর বুঝি, ইউরোপে সামারের সংজ্ঞা ঠিক তেমনটা নয়। ইউরোপে গ্রীষ্মের তেজ নমনত, উষ্ণতা মনোরম। এখানে গ্রীষ্ম, দীর্ঘ শীতল ঋতু-পর্ব পার করে চঞ্চল হওয়ার সময়। ভ্রাম্যমাণ মন এ সময় উড়ু উড়ু করেই। প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে শহুরে ক্লাস্ত মানুষেরা। চেনা ছকে তাল মিলিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের বিদায় সম্ভাষণে ভীড়েঠাসা নাগরিক সন্ধ্যাকে আরো অশান্ত মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে সন্ধে থেকে মুখ ঘোরাতেই হয় - কেননা তখন আমাদের দুর্মরভাবে টানছিল পাহাড়ের কোলে ছোট্ট কোনো গ্রাম।

গন্তব্য ছিল নরওয়ের এক অচেনা পাহাড়। ড্রেসডেন থেকে পোল্যান্ডের গাদানস্ক শহর - সেখান থেকে মাত্র ঘন্টা দু'য়েকের আকাশপথ জানি করেই পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম গন্তব্যে। নরওয়ের বার্গেন শহর। নরওয়েজেন ভাষায় বার্গেন শব্দের অর্থ পাহাড়। যেন, নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পাহাড় আর সমুদ্রঘেরা এই শহর। প্রথমে আমরা কেবিল-কারে শহরের উচ্চতম অংশ ফ্লোয়েনে পৌঁছাই। সেখান থেকে বার্গেন শহর আর ফিয়র্ডকে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আবার আমরা শহরেই ফিরি। সেখানে দেখি সামুদ্রিক খাবারের বিপুল আয়োজন, যেন নৈমিত্তিক হাটা। বিভিন্ন ধরনের মাছ, চিংড়ি, ঝিনুক, কালামারী আরো কত কিছুর পসরা সাজানো সেখানে। কিছুটা সময় বার্গেন শহরে কাটিয়ে, দুপুরের পেটপুজো সেরে আমরা রওনা দিলাম পরের গন্তব্যের উদ্দেশে। রেলগাড়ির কামরায় ৪ ঘন্টার রাস্তাটা যেন দুম করে ফুরিয়ে গেল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মুগ্ধতায় তা আমরা বুঝতেই পারলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম আমরা ক্রমশই অন্যরকম একটা জীবনে ঢুকে পড়ছি। দেখতে দেখতে টুইনডে এসে পৌঁছলাম।



Aurslandfjord - Subradeep Mandal

চারিদিকে সবুজে মোড়া পাহাড়ের কোলে এক অতিকায় ঝর্ণা আর তার পাদদেশে বয়ে চলা এক নদীর কল কল রব এখানের জনহীন নীরবতাকে আছড়ে ভেঙে দিচ্ছে। ঝর্ণার পাশেই সারি দিয়ে সাজানো কয়েকটি কটেজ আর তার মধ্যে একটা ছিল আমাদের পরের দু'দিনের আশ্রয়।

এত রম্যতার উপভোগের মধ্যেও সমস্যা একটা ছিলোই - সেটা খাবারের। টুইনডেতে খাবারের হোটেল, রেস্টুরেন্ট তো দূরের কথা কোনো দৈনন্দিন সামগ্রীর দোকান পর্যন্ত নেই। খাদ্য সংকটে বেহাল দশা যাতে না হয় আগেভাগেই তার ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছিলাম। ড্রেসডেন আর বার্গেন থেকে কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে কিনে ব্যাগবন্দি করেছিলাম। তার মধ্যে থেকেই ম্যাগি আর স্যান্ডউইচ বানিয়ে রাতের পেটপুজো সারলাম। ঝর্ণার ধারে বসে, ওই মুখর কলতান শুনতে শুনতে খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা চললো অনেক রাত অব্দি। ঘন রাতে আকাশে রক্তিম আলো, কানে ঝর্ণাজলের শব্দ, মনে একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে যখন ঘুমোতে গেলাম তখন অদ্ভুত এক শান্তি অনুভব করছিলাম।



Gudvangen - Subhradeep Mandal

পরের দিন সকালে বাস নিয়ে আমরা পৌঁছলাম গুডভাঙেন-এ। সেদিনের পরিকল্পনা ছিল গুডভাঙেন থেকে ফ্ল্যাম অব্দি ক্রুজে করে ফিয়ার্ডব্রমণ। সেইমতো জার্নি শুরু হলো নাইরোফিয়ার্ড থেকে। পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে ক্রুজ যতই এগিয়ে যাচ্ছিলো, নীলাভ জলে তার পদচিহ্ন সাক্ষী রেখে যাচ্ছিলো আমাদের অভিজ্ঞতার। একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো সেলফোসেন : এক ত্রিশলাকৃতি জলধারা নেমে এসেছে পাহাড়ের চূড়া থেকে - যেন কোনো জটাধারী আদিদেবতার সাক্ষ বহন করে চলেছে এই জলধারাট্রয়। আরেকটু এগিয়ে যেতেই আরেকটা জলপ্রপাত মেঘে ঢাকা পাহাড় থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে, তার নাম লেগডাফোসেন।

এরপর ড্রুজ নাইরোফিয়র্ড ছেড়ে ঢুকে পড়লো আওরল্যান্ডফিয়র্ড-এ। এখান থেকে চোখে পড়ছিলো নীল জলরাশির উপর তুষার আচ্ছাদিত শুভ্র পর্বতের চূড়া। দেখে মনে হচ্ছিলো বহু শতাব্দী ধরে এই পর্বতমালা দৃঢ় রক্ষীর মতো আগলে রেখেছিলো নরওয়েকে বহির্বিশ্ব থেকে। এভাবেই সতর্ক-ধাবমান আমাদের ড্রুজ পৌঁছিলো উন্ডরিডাল নামের একটা গ্রামে। গল্পের বই থেকে উঠে আসা রং বেরঙের বাড়ি নিয়ে পাহাড় ঘেরা এই গ্রাম কোনো রূপকথা থেকে কম কিছু ছিল না। তারপর ড্রুজভ্রমণের শেষ জার্নিটুকু - ফ্ল্যাম পর্যন্ত। এইদিনে দেখা আরো কিছু জায়গার মধ্যে ছিল স্টেগাসটাইন গিয়ে সেখান থেকে দেখা আওরল্যান্ডফিয়র্ড। নেটফ্লিক্সএ 'ভাইকিং', 'দ্যা লাস্ট কিংডম' ইত্যাদি সব সিরিজ দেখার সুবাদে মনের মধ্যে অজান্তেই ভাইকিং-দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তৈরী হয়েছিল প্রবলভাবে। সে সুযোগ এসে গেলো এ যাত্রার তৃতীয় দিনেই। গিয়েছিলাম ভাইকিংভ্যালি তো। নাইরোফিয়র্ড-এর পাশেই ভাইকিং-দের জীবনযাত্রাকে অনুকরণ করে একটা কৃত্রিম গ্রাম তৈরী করা হয়েছে। সেখানে একজন ছদ্মবেশী ভাইকিং গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে ভাইকিংদের সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে জানাচ্ছিল। তাদের হালকা তরী বানানোর পদ্ধতি - যা সংকীর্ণ ফিয়র্ড এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করতে পারে , তাদের অস্ত্র তৈরির পদ্ধতি - যা নিমেষে শত্রুর প্রাণহরণ করতে পারে , তাদের পোশাক-এর ফাইবার বানানোর প্রযুক্তি ইত্যাদি যতই শুনছিলাম ততই বিস্মিত হচ্ছিলাম। ভাইকিংদের হিংস্র মনোভাব সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি জানি।



Tvindefossen - Subhradeep Mandal

কিন্তু তার বাইরে এতো প্রাচীন যুগে (11th century) ওদের এরকম উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সেদিন আরো কিছু সময় ভাইকিং ভ্যালিতে কাটিয়ে আমরা ফিরে গেলাম বার্গেন শহরে। অবশেষে : বিদায় নরওয়ে! একমুঠো শান্তি আর একরাশ মুগ্ধতা সঙ্গে নিয়ে এবার ড্রেসডেন-এ ফেরার পালা; সেই কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার উদ্দেশে রওনা।

আসি বলে স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায় ঠিকই, তবে নরওয়ের গল্প এটুকুতেই শেষ হওয়ার নয়। তার কারণ গ্রীষ্ম শেষে আবার যখন শীত ফিরে আসবে আর আকাশে নিশীথ সূর্য ম্রিয়মান হয়ে পড়বে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠবে অরোরা বোরিগলিস এর ছটা , সেইদিন আরেকবার ফিরে আসতে হবে বৈকি; ফিরে আসতে হবে অন্য এক নরওয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাক্ষী থাকার জন্য।

The Fountain Pen

Aaryan Kannan (10 yrs)

Once upon a time, there was a boy named Liam who went to a very rich school. He himself went to that school just because he was intelligent, not rich. Even though he was the best in class, he didn't have any friends. He himself barely managed to get all of the supplies because they were so costly. He had 2 pens, a ballpoint pen, and a fountain pen. He really liked the fountain pen and used it all the time. One day, one of his classmates called Louis tripped on a carpet and got hurt. Nobody cared about him until Liam came and helped him to reception. After this incident, Liam and Louis became friends and helped each other when needed. In the last month of the school year, one of the many school bullies noticed that the fountain pen was Liam's favorite pen and he stole the pen at the end of the day. The next day, Liam finds out that his pen is missing and he gets sad. Louis notices this and asks him what is wrong. Liam tells about his missing pen and how much he liked it. Louis was so sorry for Liam that he wanted to do something about it so he bought Liam 10 fountain pens and told him his plan.

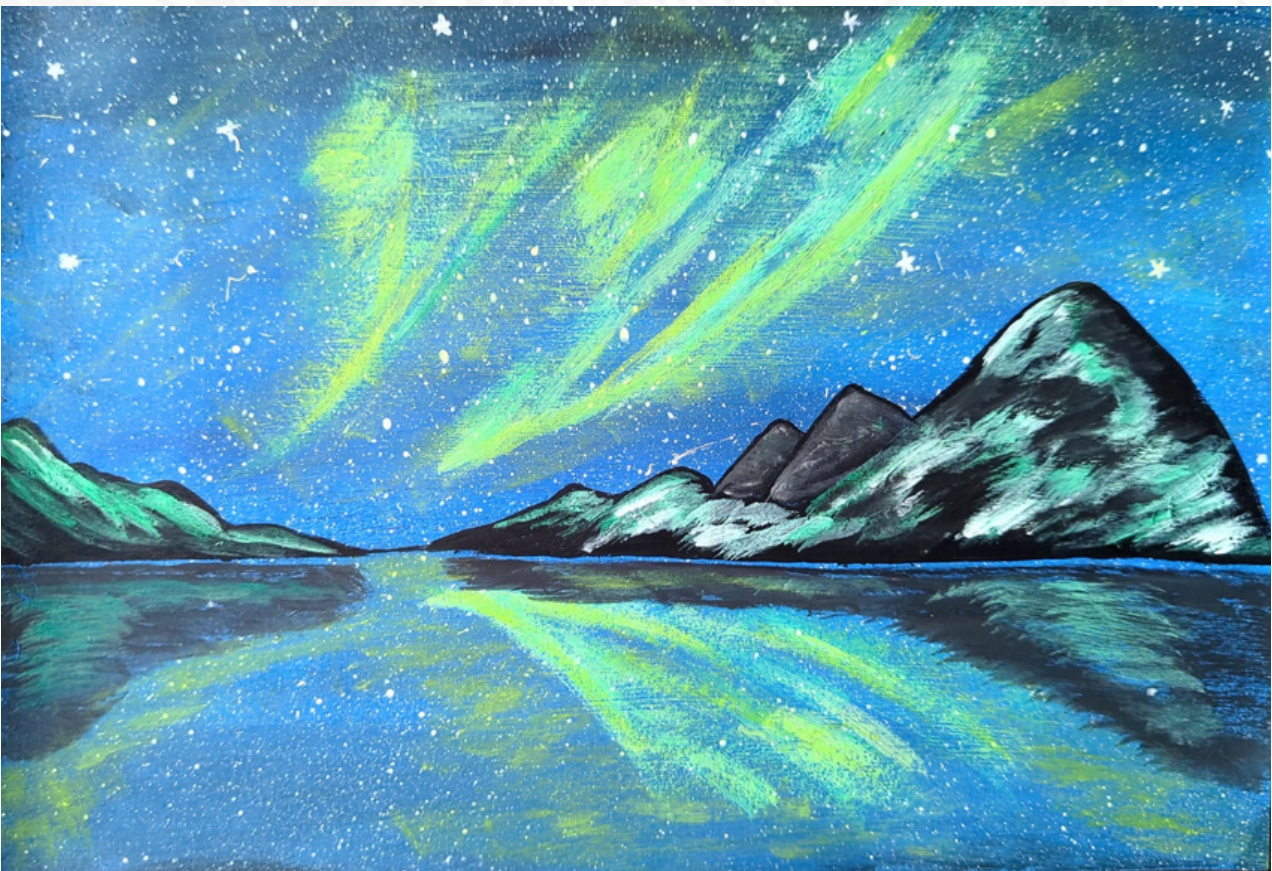
During school that day, the bully noticed that Liam got another pen and planned to steal it again. Liam pretended to go to the toilet and left his pen on his desk. The bully used this opportunity to steal the pen but he didn't notice that Louis was secretly recording him and his actions on his phone. After school, Louis showed Liam the footage and directly went to the principal to report the incident with the proof. The next day, the bully was called to the principal's office to talk about the incident and the bully got scolded and the principal gave him detention. Liam got all of his stolen pens back and thanked Louis for his help and Louis said it was his "payback" for helping him when he tripped over the carpet.

(illustration by Arka Baksi)





Expressions - Assam, India - Padmanava Sen



Northern Sky - Moumita Saha

স্মৃতিতে ক্যাপ্রি

দোলা দাশগুপ্ত

চলতি বছরের সামারটা যখন এলো তখন মনে হয়েছিল এই বছরটায় হয়ত সামারের বেড়ানোটা আর হচ্ছে না। কিন্তু সময় গড়িয়ে যখন আগস্ট এলো তখন একরকম ছুটহাট প্ল্যানেই ইতালি চলে গেলাম। প্রথম দিনে নানাদিক ঘুরে পসিটানোর হোটেলে যখন ঢুকলাম তখন সূর্য প্রায় ঢলে পড়েছে। সকালটা শুরু হলো পসিটানো থেকে ক্যাপ্রি আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য ফেরি ধরার দৌড়ানোর মধ্য দিয়ে। কোনমতে বরাবর টাইমেই ধরলাম। তাড়াছড়ার মাঝেই বুঝতে পারলাম আজ প্রচন্ড গরম হবে। তবে যাওয়ার পথে সমুদ্রের এতো সৌন্দর্য গরমের চিন্তা ভুলিয়ে দিলো। ফেরিটি যখন সমুদ্রের জল চিড়ে সামনে যাচ্ছিল দু'পাশের পাহাড় আর এত নীল জল দেখতে দেখতেই ২৫/৩০ মিনিট নিমেষে কেটে গেলো। এরপরের বেশ কয়েক ঘন্টা ঘুরে দেখলাম। প্রথমে ফেরিঘাট থেকে বাস কিংবা ট্যাক্সি করে সেন্টারে যেতে হবে। সামারে প্রচুর পয়টিক বলে দুটোর জন্যই লাইনে অপেক্ষা করতে হবে। ট্যাক্সি নিয়ে সেন্টারে এসেই দেখলাম প্রচুর মানুষের ভীড়, আর মাথার ওপর সূর্যের প্রখর তাপে টেকা দায়। ক্যাপ্রির গলির দোকানগুলো অনেক সুন্দর। অনেক জিনিসে ভরপুর ট্যুরিস্টিক অন্য সিটির মত, তবে সব জিনিসেরই অনেক দাম মনে হলো। পোসেলিনের বেশ সুন্দর কালেকশন। দাম চড়া, এক সেন্ট ও কম হচ্ছে না। এর মাঝেও ওয়ালডেকর পছন্দ হল, নিয়ে নিলাম। আরো একটা সুভেনির নিলাম। এই দ্বীপে গাইডেড গ্রুপ ট্যুর নেয়ার অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যদিও নিজেরাই ঘুরে দেখেছি।



Porcelain Store, Capri, Italy - Dola Dasgupta

ইতালির এই দ্বীপের আগে যতবারই ইউটিউবে ভিডিও দেখেছি, দেখলাম বলছে, পসিটানো গেলে ভ্রমণপিপাসুরা যেন একবার হলেও লিমোনসেলোতে গলা ভেজায়। পসিটানোর মানুষেরা এই লিকারকে নিজেদের পরিচয় দিলেও ক্যাপ্রির অধিবাসীদের তা নিয়ে দ্বিমত আছে। তাদের কাছেও লিমোনসেলো নিজেদের স্বকীয়তা হিসেবেই বিবেচ্য।

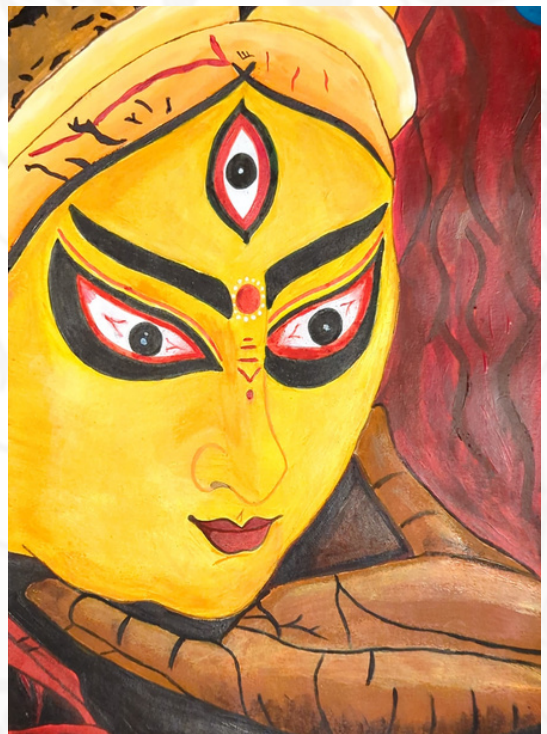
দ্বীপের উঁচু পয়েন্ট থেকে পাহাড়ঘেঁসা সমুদ্র যেন ছবির মত সুন্দর। সামারের পিকটাইমে গিয়েছি বলে অনেক মানুষ আর খুব গরম থাকলেও ক্যাপ্রির মুগ্ধতা অনেকদিন থাকবে বোঝা যাচ্ছে।



Seaview, Capri, Italy - Dola Dasgupta



Vinayak-Dinesh Bera (6 yrs)



আবার এসো মা - Moumita Saha

মনে বৃষ্টি

ঋতম ব্যানার্জী

পর্ব-প্রথম

ঘন কালো মেঘে রহিয়াছে ভোরে,
সারাদিন ব্যাপী বৃষ্টি যে ঝরে।

-

আজকে সারাটা দিন শুধুই বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মাটির উত্তাপ একছুটে গিয়ে দাড়িয়েছে দশম ডিগ্রির ঘরে।
উষ্ণতার এত অবাধ বিচরণ সে কি শুধুই সৃষ্টির? না কখনই না। সেত আরো জীবন্ত আরো প্রাণবন্ত
মনের গোপনিতায়, ভাবনার ঘনিষ্ঠতায়।।

-

পর্ব-দ্বিতীয়

কি ভীষণ মিল সৃষ্টি আর মনে,
রোদে মেঘে জলে বানায় স্বপনে,
সম্মুখ সমরে ছোট্টে নব দিন গুনে।

-

সত্যি বলতে কি, বৃষ্টি কখনো মন খারাপের বলে ভাবিনি আমি। বৃষ্টি ভেজা দিনগুলই যে রাতের
আঁধারের থেকেও মনের দৃশ্যমানতা ঘন কুয়াশায় ঢেকে দেবে তাও না।

অবশ্য আজ কিন্তু মনের ভাবনাটা আলাদা। না! ঠিক ভাবনা নয় মনের অনুভূতিটা আলাদা।।

-

পর্ব-তৃতীয়

মেঘের কিনারে জলবিন্দুরি ভায়ে
বহিয়াছে মন তোমারি বিরহে।

-

মনখারাপের বৃষ্টি যখন মেঘবালিকার ঘন কেশগুচ্ছ স্থূলিত হয়ে বাতাসের গতিপথে আছড়ে পড়ে
পার্শ্ব দাবদহকের ঘাতক হয়ে, সেই উদ্দামতা বাহ্যিক আবরণকে স্নিগ্ধতা দিলেও অনাবৃত করে দেয়
আন্তরিক ভবনাগুলোকে, গহীন অনুভূতিকে। যেখানে শুধুই তোমার শূন্যতা, তোমার বিরহ।।

-

পর্ব-চতুর্থ

বিরহ বারি জাঁচে,
তোমার নামের আনাচে কানাচে
কখন মনের গোপন ফাঁকে,
দিলে তুমি ধরা আমার বাঁকে।

একি! আমার গাল ভেজা কেন?

তাহলেকি পড়ন্ত বিকেলের গোধূলি লগ্ন অশ্রু বিগলিত মুক্তমালায় প্লাবিত করেছে আমায়? ঐ যে ঐ বৃষ্টিমাত দিনের শূন্যতা, তা এখনো জলীয় বাষ্পাকরে আশ্রিত আমার কনীনিকাদয় এর আলিঙ্গনে। হাঁ, আমি তোমার অভাবে প্লাবিত। আমাকে না জানিয়েই বৃষ্টি ভেজা আবেগ রক্ত স্রোতে বাহিত হয়ে অন্তকরনে ক্রমাগত তোমার চিত্রায়নেই ব্যস্ত।।

-

পর্ব-পঞ্চম

হৃদয় দোলায় নব হিল্লোল,
কাজ্জিক্ত যত স্বপ্ন সকল,
বাহিলা মোরে তব ধরাতল বন্দিত স্বপনে।

-

এই মন খারাপের বৃষ্টিটাই যে চোখ ভিজিয়েও ঠোঁটের কিনারে মুচকি হাসির সঞ্চারক হবে তা বুঝিনি আমি। একটা শূন্যতা চোখে উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দিয়ে যাবে তাও জানতাম না। মন আজি ভালবাসায় মাতোয়ারা।।

-

পর্ব-ষষ্ঠ

প্রবল বর্ষণের এই ঘনঘটা,
ভেজাও আমায় ওগো চারুলাতা।
তব ছায়াতল ভরিছে সকল,
গহীন মনের অস্থিরতা।

-

প্রবল বর্ষণ বাইরের আবরণটাকে ভেজালেও,
মনটা আজি তোমার প্রেমাসিক্ত।
হঁ্যা আমি তোমায় ভালোবাসি।।

-

পর্ব-সপ্তম

অরুণালয়ে উঠল ফুটে,
হৃদয়ান্তের মিথ্যে লুটে,
সুন্দর এই জীবন মাঝে,
সত্যের এই গোপনতা।

-

বৃষ্টি শেষের পরিবেশটা কত শান্ত, কত শীতল।
আরে, আকাশের ঐ দিকটাতে রামধনু ফুটেছে না।
সত্যিই কল্প রঙ প্রকৃতির। এত শত শত মিথ্যের মাঝেও সম্পর্কের সত্যতা আজ প্রতিষ্ঠিত।
এই নীরব সত্যিই হোক আমাদের প্রজন্মগত বাহক।।



Ishani Chakraborty (12 yrs)

প্রবাসে উৎসবে অনিন্দ্য মুখার্জী

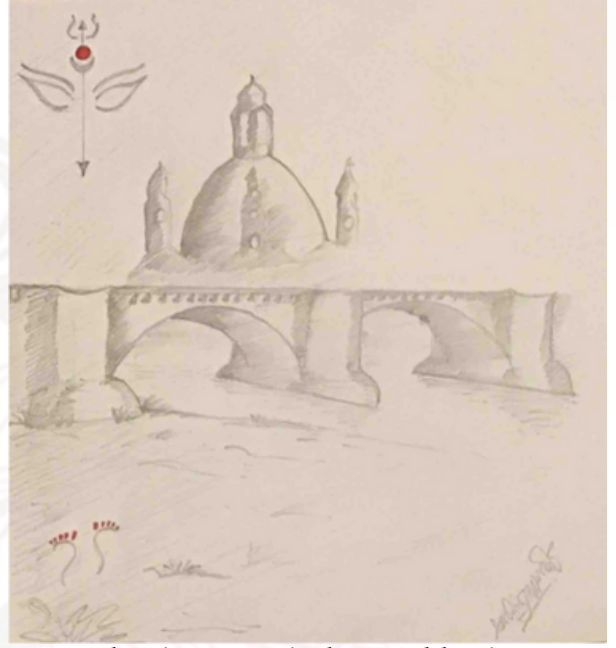
আয় নেমে আয় আমার কাছে,
শিউলি হয়ে বরবো দুজন-
চাকের সুর হাওয়ায় ভাসে,
আশ্বিনের আজ উদযাপন।

চল পালিয়ে ওই যেখানে,
ধানের খেতে আকাশ মেশে-
হেসে হেসে পুজোর কথা,
বলছে কতই ভালোবেসে।

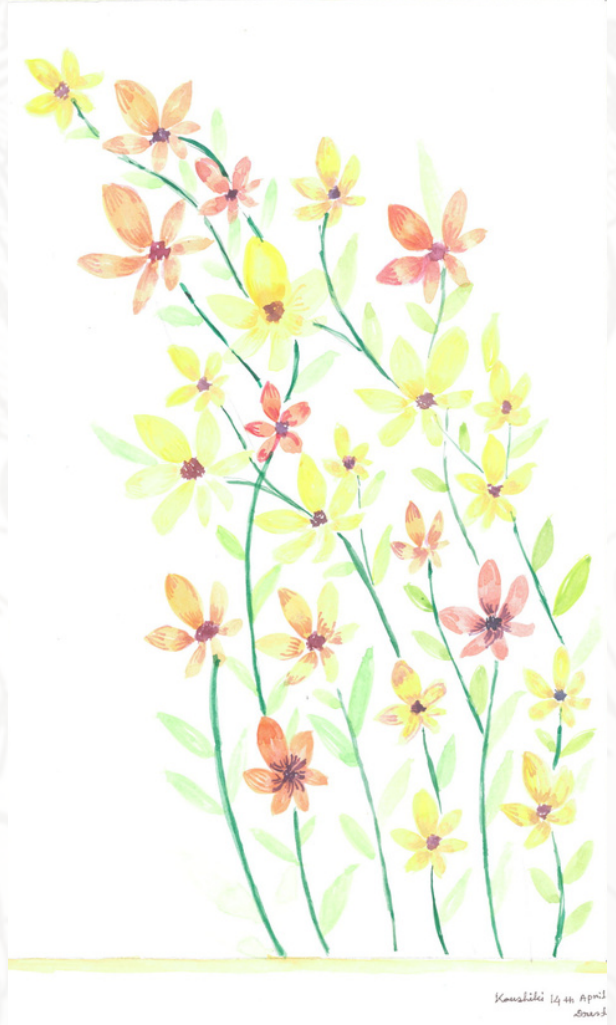
সান্তনা দেয় শরৎ বাতাস,
মনের ভিতর পুজোর আভাস-
পাইন বন আর পাহাড় আছে,
আসবি নাকি আমার কাছে?

জলছবি ওই স্মৃতির টানে,
মুক্তো শিশির সকালবেলা-
আগমনীর বার্তা আসে,
হালকা মেঘে রোদের খেলা।

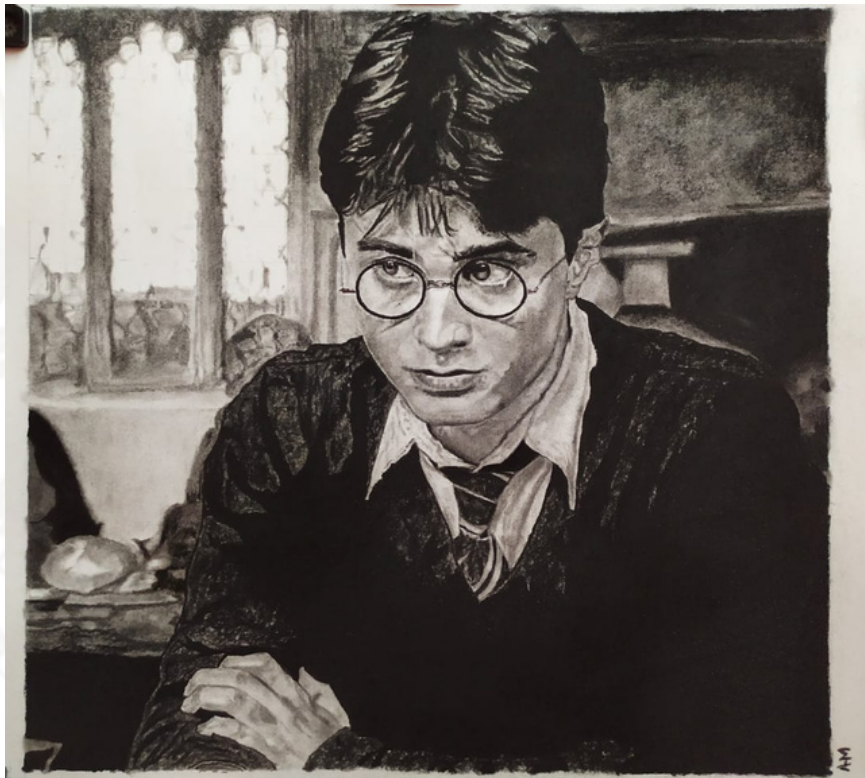
ওই শরৎ, তোর খুশির হাওয়া,
মাতাল নেশা উদাস মন -
হৃদয় মাঝে দেশের কথা,
প্রবাসে পুজোর উদযাপন।



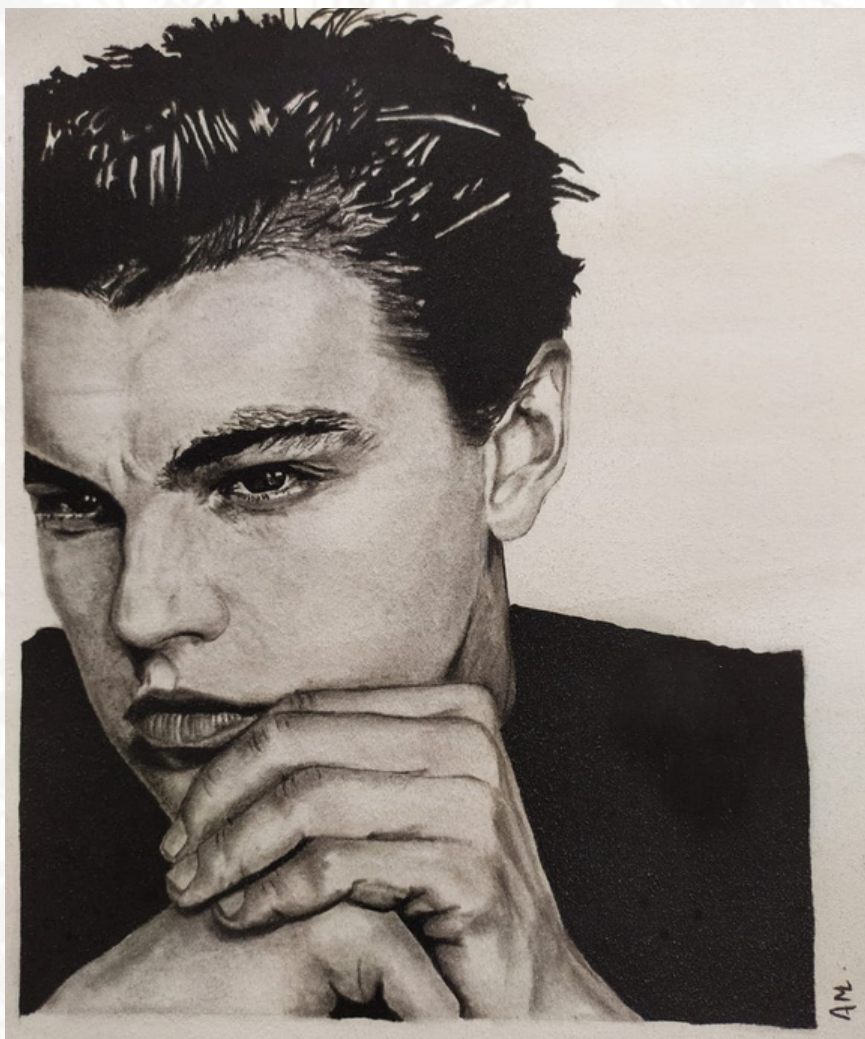
Blessings - Anindya Mukherjee



Joyous - Koushiki Chattopadhyay



Expelliarmus-Anubi Mallick



Pensive -Anubi Mallick

Iceland Trip - A Travel Diary

Shatabda Saha

Day 0:

This was a family trip - my wife, 2 kids (4 yrs & 4 months old!), my brother and I. My brother flew in from the UK while we arrived at Keflavík International Airport, directly from Dresden. Our flight operated by GermanWings was very comfortable. Unfortunately, GermanWings ceased its operations in 2020, so currently, there is no direct flight from Dresden to Iceland.

We had booked a hotel close to the Airport and my brother who had arrived a few hours earlier, collected us from the airport in our pre-booked rental car. We needed a good night's sleep to prepare ourselves for our upcoming 2 weeks of adventure!

Day 1:

Post breakfast, we headed out towards our first destination Ólafsvík in West Iceland. On the way we drove through amazing landscapes! We made several short stops to witness the sheer natural and raw beauty of nature. We visited Búðakirkja, a small wooden church dating back to the 19th century in a scenic natural area with a lava field. We saw Gatklettur, a dramatic stone formation in the shape of an arch, with bird-rich cliffs in the fishing village of Arnarstapi, and then headed to our booked accommodation.

Day 2:

After having breakfast, we set out on our journey and visited the very famous Kirkjufell and the Kirkjufellsfoss, an iconic waterfall with a panoramic view with the Kirkjufell in the background. Then we visited the amazing colourful Hraunfossar, waterfalls cascading into the Hvítá river over ledges of lava rock, with paths and a viewing platform. We then headed to our accommodation for the night in Stadarflot.

Day 3:

We visited Glaumbær Old Turf Farm with Turf houses and the very famous Goðafoss, a spectacular waterfall plunging over a curved, 12m-high precipice, with paths to multiple viewpoints. That night, we stayed at Svalbarðseyri.

Day 4:

With the weather not looking very promising and a forecast of snowstorms in coming days, we started our day visiting Lake Mývatn in areas around Hofdi that provide opportunities for a nice walk. Then we headed to Krafla, barren active volcanic caldera at 2,130 feet with an icy blue crater lake and a nearby power station. After visiting Leirhnjúkur (an active volcano), we headed to Hverir, a geothermal spot in the Myvatn Geothermal Area noted for its bubbling pools of mud and steaming fumaroles emitting sulfuric gas. After this we headed to Dettifoss, Europe's most powerful waterfall located in Vatnajökull National Park. With onstantly deteriorating weather and upcoming rain and storm forecast for the coming days we headed to our accommodation in Grenjaðarstaður.



Vestahorn at Sunrise - Shatabda Saha

Day 5:

With persistent rain and temperatures around 2 degrees we decided to spend the day at Mývatn Nature Baths, a lagoon-like outdoor baths with milky blue mineral-rich water, naturally heated by hot springs. A perfect way to spend a day when bad weather makes going out impossible. Then we headed to our accommodation in Húsavík.

Day 6:

Bad weather and snow storms meant there were no boat trips for Whale watching. With a heavy heart we left Húsavík for Egilsstaðir, our destination of the day. We braved strong snowstorms and icy roads with poor visibility. Driving very carefully and following constant updates from the weather department, we made slow progress to our next stop. Luckily as we arrived at Egilsstaðir the weather brightened up.

Day 7:

After an adventurous drive through the snow storm we set out for our next adventure: Hengifoss, third highest waterfall in Iceland. It is more than an hour-long hike leading to this dramatic cascade falling from a height of 128 m. over striated rock. The hike was not easy and we needed to cross some streams at the end. After that, we headed to a hidden gem of Iceland: Follaldafoss, a waterfall in a remote location. This scenic waterfall can be reached via Route 939, also called the Oxi Pass. This is not an easy road and should be travelled with caution! Then we headed to Höfn where we would be staying for the next 2 days. From this point we entered South Iceland, the most commonly visited area of Iceland.



Diamond Beach - Shatabda Saha

Day 8:

The day started with an amazing sunrise at Vestrahorn. Standing in the cold in the black sand flat of Vestrahorn waiting for the first glimpse of sun over the majestic Vestrahorn is an experience that can only be felt and not expressed! After witnessing the sunrise on a chilly morning, we headed to the warmth of our hotel for breakfast. Then, we visited Jökulsárlón, a famed glacial lake with floating icebergs and wildlife sightings of seals and skuas. Just across the road from here is the famous Eystri-Fellsfjara or Diamond Beach, a striking black-sand beach famed for the huge, glistening iceberg fragments that drift ashore. The day ended with an amazing sunset where we witnessed the golden light flooding the sand flat of Vestrahorn with a herd of horses completing the perfect picture. It was indeed an experience to remember! With that in our minds, we headed to Kirkjubæjarklaustur for our next 2 days to stay at a beautiful camping area with nice cottages that we had rented

Day 9:

We started with Fjallsárlón, the lagoon that offers close-up views of the glacier. Then we visited Hofskirkja, a beautiful turf church in the Örfæfi region in South-East Iceland. Then we headed to Svartifoss, a narrow stream of 20-m. waterfall down the centre of a dramatic 3D wall of hexagonal basalt columns located in the heart of Vatnajökull National Park. This waterfall can be easily reached via a moderate hike.



Vestahorn at Sunset - Shatabda Saha

Day 10:

We visited the Fjarðarárgljúfur, a deep and winding river canyon, about 2 million years old, with a walking path and panoramic views. Then we witnessed the Eldhraun, a lava field covered with mossy boulders, dating from a 1780s eruption. It was easily accessible from the main road.

Day 11:

The day started with a visit to the famous Reynisfjara black sand beach, near the small fishing village of Vik. Jagged rocks stand jutting out of the sea just off this black sand beach with basalt formations. Very close to this place is Dyrhólaey, a small peninsula with picturesque views, a lighthouse and a large volcanic rock arch in the sea. From here we headed towards Skógafoss, one of Iceland's biggest and most beautiful waterfalls with an astounding width of 25 m and a drop of 60 m. We checked into our accommodation at Drangshlíð, very close to the Skógafoss. After that we set out for a hike through the black sand to Sólheimasandur where you can find a DC-3 plane wreckage. Lying abandoned in the sand, a deteriorating skeleton, with nothing but endless black sand surrounding it.



Skógafoss - Shatabda Saha



Sólheimasandur - Shatabda Saha

Day 12:

Our day started with watching Skógafoss at sunrise and then going back to the fall again to spend some fun time around the fall. We headed to visit Seljavallalaug Swimming Pool, a remotely located outdoor swimming pool 25 m. long, 10 m. wide. Sitting in the lap of nature surrounded by mountains and a flowing stream next to it, the pool is another hidden gem of Iceland. After this we headed to Seljalandsfoss, a waterfall that can be fully encircled, situated on the South Coast of Iceland with a drop of 60 m. One of the most visited waterfalls in Iceland, you can walk right behind the waterfall and enjoy a true 360 degree view of this waterfall. After watching the sunset at Seljalandsfoss we headed to Hella for the night.

Day 13:

With bad weather striking again we did not have much to explore and we took it easy for the day, mostly relaxing and cruising to our next stop at Laugarvatn.

Day 14:

With only a day remaining and so much left to see, with a heavy heart we had to select and drop some places from our list. We started with Haukadalur, a famous valley featuring a variety of ancient geothermal geysers, hot springs and bubbling

mud pots. The major attraction of the valley is the Strokkur geyser that erupts every 8–10 minutes and reaches heights of 20 m. We then headed to Gullfoss, an iconic waterfall known for its multi-step cascade along a 90° bend of the Hvítá River. After this we headed to Haifoss, another hidden gem of Iceland. A dramatic waterfall in a remote location was not an easy drive. However, reaching the top and witnessing the gigantic fall makes all the effort worth it. We ended our trip on a high witnessing the majestic Haifoss and started our drive back to Keflavik Airport. My brother had a flight the next morning so he checked into a hotel and we rested for a while. Then we headed to the Airport to hand over the rental car and then to the Airport terminal. We bid goodbye to my brother and he headed to his hotel. We checked in for our flight back to Dresden after an amazing 2 weeks in the Land of Ice and Fire.

14 days, panoramic drive of 3200+ km, witnessing majestic mountains, deep valleys, waterfalls, beach, glacier, hot water springs, geothermal fields. Hold your breath, Iceland has so much more to offer. One trip is never enough. It's just the tip of the iceberg. Dive deep to explore more, experience more.

Bis zum nächsten Mal!



Dresden by night - Poulami Chowdhury



Atelier Mother Nature at its finest - Painted Hills, Oregon
- Padmanava Sen



Hidden in the clouds - Bromo National Park, Indonesia
- Padmanava Sen

টেনেরিফা দ্বীপে কিছুদিন

রাজীব সরকার

দীর্ঘ এক বছর আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। করোনার প্রকোপে সমস্ত কিছুই এত বেশি নিয়মের বাইরে চলেছে এবং এখনও চলছে যে, কোনো কিছু পরিকল্পনা করা আর সহজ নয়। পরিকল্পনা করলেও তাকে বাস্তবিক করে তোলাও সহজ কর্ম ছিল না। এই রেগেল সেই রেগেলের চক্করে সবারই নাস্তানাবুদ দশা। প্রতিনিয়ত আবার সেই রেগেল বা নিয়ম বদলেও চলেছে। সব বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে টেনেরিফা দ্বীপে ঘুরে আসার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করেই ফেললাম। টেনেরিফা স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের আটটি দ্বীপের মধ্যে একটি, এবং এটি সবথেকে আয়তনেও বড়। আফ্রিকার খুবই কাছে এবং স্পেনের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত এই দ্বীপগুলো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেই আছে এই দ্বীপগুলো, তাই ইউরোপ থেকে এখানে যাতায়াত করতে ভিসার আবশ্যিকতা নেই। জার্মানি থেকে যাতায়াত করা মানে প্লেনের টিকিট করতে পারলেই হলো। ড্রেসডেন শহর থেকে টেনেরিফা যাতায়াতের উড়োজাহাজ চলে। ঠিক সেই কারণেই যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে সেই টিকিটই করেছিলাম। শেষে অবশ্য সেই টিকিটটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাতিল করতে হলো। ড্রেসডেন শহর থেকে টেনেরিফার উড়ানগুলো সব বাতিল হয়ে গেল। অন্যদিকে আবার করোনাতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একদিকে ভ্যাক্সিনেশন বা টিকাদান শুরু হয়েছে বটে, তবে সমস্ত জনতাকে সেই টিকাদান করতে অনেকটা সময় লেগেই যাবে। আবার এরও তো নিশ্চয়তা নেই যে টিকাদান করা মানেই এই করোনার আবার অন্য আরেকটি বিভিন্নতা মানুষের কাছে ধরা দেবে না। সংক্রমণের সংখ্যার এই ক্রমাগত ওঠা-নামার ফলে মানুষও বিরক্ত। যেন মানুষ এবং ভাইরাসের এক অদ্ভুত অহং-এর খেলা চলছে। কে হারবে, কেই বা জিতবে সেই নিয়েই এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা। ড্রেসডেন শহর থেকে আকাশপথে কোনো যথাযথ যোগাযোগ না থাকার কারণে, বাধ্য হয়ে বার্লিন ব্রান্ডেনবুর্গ বিমানবন্দর থেকে টিকিট কাটলাম। বার্লিন থেকে সরাসরি টেনেরিফা সাউথ।

অন্যান্য বছরের মতন এই বছরে শুধুমাত্র উড়োজাহাজের টিকিট কেটেই উড়োজাহাজে চাপা যাবে না। করোনার-এই সংকটকালে অনেক বিধি-নিষেধ আছে যা মেনে চলা আবশ্যিক। না মানলেই যাতায়াতের বাঁধা। প্রথম যে নিয়মটির সম্মুখীন হলাম, তা হল উড়োজাহাজে চাপার আগে একটি ল্যাব-টেস্টের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে করোনা ঋণাত্মক, মানে যাত্রীর দেহ করোনা ভাইরাস মুক্ত। না, আবার যা তা পরীক্ষা করলে হবে না, একেবারে পি সি আর পরীক্ষার প্রমাণপত্র হাজির করতে হবে উড়োজাহাজে বোর্ডিং ছাড়পত্র হাতে পাবার আগে। সেই নমুনা-নেবার তুলো সমেত কাঠি যখন নাসিকার গভীরে প্রবেশ করানো হয়, তখন সবকিছু ল্যাব-এসিসটেন্টের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। নাসিকার মধ্যে এদিক ওদিক বলপ্রয়োগে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা এক যন্ত্রণার বিষয়। তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ৬ বছরের অধিক বয়সের কচিকাচাদের জন্যেও একই নিয়ম, তাই তাদেরও দুর্দশার শেষ নেই। ফলত করোনাকালে উড়োজাহাজে করে ছুটি কাটাতে যাবার মানে অনেক ঝঙ্কি ঝামেলা পোয়ানো। যতবার যাত্রা ততবার করাতে হবে এই পরীক্ষা এবং তা খরচাসাপেক্ষও বটে। একেবারে সুন্দর একটি ব্যবসা চলছে স্বাস্থ্যকে নিয়ে। কিন্তু কি আর

করা, বেশ কিছু টাকার গচ্ছা দিয়ে সেটা করেও ফেলতে হল। এইসব করার পরে উড়োজাহাজে চেপে বসলে মাস্ক পরে থাকা বাধ্যতামূলক, তাও মাস্ক মানে FFP2 মেডিক্যাল মাস্ক! আর এই আপদকালে উড়োজাহাজে খাবার এবং পানীয় বিতরণও বন্ধ ছিল। সব মিলেমিশে মোটেই ছুটি কাটাতে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছিল না, পরিবর্তে মনে হচ্ছিল যেন কড়া প্রশাসনিক ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে চলেছি।

এতসব করে শেষমেশ অনেকটা বিকেলের দিকে আমরা টেনেরিফাতে পৌঁছলাম। চারিদিক বেশ আলো ঝলমল করছে তখনও। বিমানবন্দর থেকে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানর জন্যে আগে থেকে কিছুই ব্যবস্থা করে রাখিনি। টেনেরিফা সাউথ বিমানবন্দর থেকে আমাদের থাকার জায়গা একেবারে উত্তরে আনুমানিক ১০০ কিলোমিটার দূরে, সেই অঞ্চলটির নাম ‘পুয়েত্রও দে লা ক্রুজে’। এমনিতে বাস, এমনি ট্যাক্সি, সাটেল সব কিছুই যথেষ্ট যোগান থাকে। কিন্তু ভুলে গেলে চলে না, এখন সময়টাই অন্যরকম। যা অনুমান করেছিলাম তাই হলো, অনেক পরিষেবাই টিম টিম করে আলো দিচ্ছে। কিছুটা সময় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার পরে, একজন বছর ৫০ এর বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাঁর মুখ বেশ প্রসন্ন, এবং ওলা (হ্যালো) বলে তিনি আমাদের সাথে আলাপ শুরু করলেন। তিনি কিছুটা জার্মান এবং ইংরেজি ভাষা মিশিয়ে বললেন, “আমার নাম হল আলেস। আপনারা যদি ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করেন তাহলে আমার গাড়ি নিয়ে ছোট্ট একটি ট্রিপ সেড়ে আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিতে পারি। তাতে আপনাদের খরচও অনেক কমে যাবে।” আলেস টেনেরিফা দ্বীপেই বড় হয়েছেন। কয়েকবছর আগেই তাঁকে ক্যান্সারের নিরাময়ের জন্যে একটি বড় মাপের শল্যচিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। এক কানের নিচের থেকে গলা হয়ে আরেক কানের নীচ অবধি এখনও স্পস্ট কাটা-হেঁড়ার দাগ। এক বছর এর জন্যে তিনি কোনোরকমের কাজকর্ম করতে না পারলেও, এখন সবই ঠিক আছে। শুধু সেই সার্জারির পর থেকে তাঁর কথা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আলেসের বয়ানে তাঁর তিন তিনজন ফ্রাউ, মানে স্ত্রী একজন নাকি রাশিয়ান, আর বাকি দুইজন স্পেনীয়। আলেসের কথা অনুযায়ী উত্তর টেনেরিফা অনেক বেশি সুন্দর, সবুজ এবং তুলনামূলক বাজেটফ্রেন্ডলি, আর দক্ষিণ টেনেরিফাতে পর্যটকদের ভিড় বেশি। এখানকার সমুদ্র সৈকতে, গা পোড়ানো এবং রৌদ্র তাতে শুয়ে বসে থাকতেই অধিকাংশ পর্যটকদের আনন্দ। সুতরাং দ্বীপের ওই দিকটি ব্যয়বহুল। নিজের চোখে ঘুরে দেখেছিলাম, তার কথা সত্য। বিমানবন্দর থেকে আমাদের হোটেলে যাওয়ার পথে আলেস এরকম আরো অনেক তথ্য আমাদের দিয়েছিল, যেমন টেনেরিফার জনসংখ্যা কত, কবে থেকে পর্যটকদের চল নামা শুরু হয়েছে, আরো কত কী! পরে উইকি-তে ঘেঁটে দেখেছিলাম তাঁর দেওয়া প্রতিটি তথ্যই প্রায় সঠিক ছিল। তবে সত্যিই যে তাঁর তিনজন ফ্রাউ আছে, সেই তথ্য কতোটা সত্যি তা আমার আমার আর খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। আলেসের ফোন নাম্বারটি আমার ডাইরিতে লেখা আছে। আশা রাখছি ভবিষ্যতে আবার টেনেরিফাতে গেলে, তাঁর সেই তিনজন স্ত্রীর গল্প শুনে আসব! প্রথমে যখন ‘পেজ আজুল’ এপার্টমেন্টটি আমাদের থাকার জন্যে ঠিক করি টেনেরিফা দ্বীপে, তখন জানতাম না এই শব্দদুটোর মানে কী। শব্দদুটো অবশ্যই স্পেনীয়। পেজ মানে মাছ, এবং আজুল মানে নীল। একসাথে করলে বলা যায় নীল মাছ। যাই হোক একজন বাঙালি হিসেবে মাছের প্রতি আকর্ষণতো থেকেই যায়। তাই নীল সমুদ্র, নীল আকাশ, নীল নাম দিয়ে এই আবাসন - নীলের এই সমাহারে আমার আদরের ছেলে নীলের নামের সাথে মিলেমিশে এক অদ্ভুত আনন্দ দিয়েছিল। পেজ আজুল এপার্টমেন্টটি বিলাশ বহুল নয়। তবে একজন পর্যটকের যা যা প্রয়োজন সবই মজুত ছিল।

সারি সারি সাজানো ঘরে একটি করে ছোট্ট পাকশালা ও সঙ্গে বুল-বারান্দা। আমাদের এখানে খুব ভালো কেটেছিল কয়েকদিন। আমরা টেনেরিফাতে সব চেয়ে বেশি ব্রিটিশ, জার্মান ও রাশিয়ান পর্যটকদের দেখেছিলাম। শীতের দেশের লোকেদের এখানে আসার আকর্ষণের কারণ এখানকার আবহাওয়া, পরিবেশ, সমুদ্র, পাহাড় এবং তাপমাত্রা। মূলত এপ্রিল মাসের শুরুতে এই আকর্ষণ একটু বেশিই থাকে। ড্রেসডেনের কথা তুলনা করলেই বিষয়টি সহজ হবে। এপ্রিল মাসের শেষে ড্রেসডেনের তাপমাত্রা এই ০ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে। মাঝেমধ্যে সূর্যের আলো দেখা গেলেও, তা স্থায়ী নয় - এই আসছে এই যাচ্ছে। এছাড়াও আছে হালকা বৃষ্টি, তুষার মিশ্রিত বৃষ্টি, মেঘলা ও ঠাণ্ডা। অন্যদিকে ঠিক একই সময় টেনেরিফার তাপমাত্রা ১৪- ২৩ ডিগ্রি, এবং সব সময় রৌদ্রোজ্জ্বল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঠাণ্ডা অথচ যোগাযোগের সুবিধা আছে এইরকম দেশের মানুষের ভিড় যে এখানে এই সময় উপচে পড়বে তা স্বাভাবিক। টেনেরিফা ভৌগোলিক দিক থেকে এমন স্থানে অবস্থিত যে এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই পরিবেশের তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক। পরিবেশের তাপমাত্রা আরামদায়ক হলেও সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা সেই ভাবে তখনও স্নানের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

টেনেরিফা দ্বীপে বাসে বা গাড়ি করে ঘুরলে দেখা যাবে পাহাড়ি অঞ্চলের ধাপে ধাপে কলা আর আগুর গাছের সারি। এছাড়াও এখানে আলু আর টমেটোর চাষ হয়। কিছু বছর আগে অবধিও এই চাষ ছিল এই দ্বীপের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। টেনেরিফাতে ১৯৮০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক আসতে শুরু করেন। মূল আকর্ষণ অবশ্যই এখানকার আবহাওয়া। সাদা এবং কৃষ্ণাঙ্গ দুই ধরনেরই সমুদ্র সৈকতের দেখা মেলে টেনেরিফার সমুদ্র সৈকতে। যে সমস্ত অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি থাকে, এবং সেখানকার কাছাকাছি সমুদ্র সৈকতে এই ধরনের কৃষ্ণাঙ্গ সমুদ্র সৈকত পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি থেকে যুগ যুগ আগে নির্গত লাভার কৃষ্ণাঙ্গ পাথরগুলোই যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের জলের সংঘর্ষে, ঢেউ, জোয়ার ভাঁটার খেলায় সময়ের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালি কণায় রূপান্তরিত হয় এই কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণের সমুদ্র সৈকতে।

অনেক ঘটনার মধ্যে যে গল্পটি করতে এখানে মন করছে সেটি ফিরে আসার দিন ভোরের ঘটনা। খুব সকালে ছিল আমাদের ফিরে আসার বিমান। আগেই লিখেছি প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে টেনেরিফা বিমানবন্দর। ফিরে আসার একদিন আগে আলেসকে ফোনে বলে রেখেছিলাম নির্দিষ্ট সময়ে ও যেন গাড়ি নিয়ে আসে আমাদের বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবার জন্যে। আলেস তাঁর নিজের ছন্দেই বলেছিল, কোনো সমস্যা নেই আমি একদম সঠিক সময়ে আপনার হোটেলের কাছে চলে আসবো। সব ঠিক ঠাকই চলছিল। আধা ঘুম থেকে খুব সকাল সকাল উঠে একেবারে কোনোরকমে প্রস্তুত হয়ে, জিনিসপত্র নিয়ে হোটেলের সামনে অপেক্ষা করে আছি। যে নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি আসার কথা সেই সময়ে গাড়ি এসে উপস্থিত হলো না। এতে আমাদের টেনশন বাড়তে শুরু করলো। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে যখন কোনো গাড়ি আমাদের জন্যে এসে উপস্থিত হলো না, তখন আলেসের নাম্বারে ফোন করলাম কিন্তু সে ফোন তুলছে না। এতে আমাদের অস্থিরতা আরো যেন বেড়ে উঠছিল। আবার ফোন করলাম, তাতেও ফোনের কোনো উত্তর এলো না। অন্য একটা লোকাল ট্যাক্সি সারভিসের নাম্বার আমার কাছে ছিল। সেখানেও ফোন করে ফোনে পেলাম না। পথ ঘাঁট শূন্য, আশে পাশে একেবারে নিস্তব্ধ, কোথাও কিছু নেই, বাসস্থানের রিসেপশনেও কেউ নেই। এখনই আমাদের একটা ট্রান্সপোর্ট দরকার।

আমরা মোটামুটি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেইদিন আর আমাদের ড্রেসডেন ফেরা হচ্ছে না। পরের দিনের উড়ানই নিতে হবে। বেশ কিছুটা হতাশ হয়েই আমরা দাড়িয়ে আছি। হঠাৎই আমার ফোন বেজে উঠলো। ভেসে উঠলো আলেসের নাম। আলেস বললো বিশেষ কারণে সে আসতে পারছে না। তবে একজন রাশিয়ান ভদ্রমহিলা একটি বড় ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের কাছে আসছে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে উপস্থিত হবে। সেই বলে সে ফোনটি কেটে দিলো। তবে সে মিথ্যা কথা বলে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো শক্তিশালী আলো জ্বালিয়ে একটি গাড়ি এসে আমাদের সামনে এলো। সেখান থেকে নেমে এলেন অতিকায় এক মহিলা। ভাঙা ইংরিজি, ভাঙা জার্মান এবং রাশিয়ান ভাষায় আমাদেরকে তাঁর গাড়িতে আপ্যায়ন করলেন। মাল পত্র খুব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো বিমান বন্দরের দিকে। তবে গাড়ি কিছুটা চলার পরেই দেখলাম গাড়িতে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাই যে গতিতে সে আমাদের নিয়ে আসতে চাইছিল তা সে পারলো না, তাও ঠিক সময়েই কোনোভাবে সে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেদিনেই আমরা ড্রেসডেনেও ফিরে আসি। ভদ্রমহিলাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আলেসের কী সমস্যা হয়েছে। তিনি কোনো উত্তর দেন নি। সব মিলিয়ে অনবদ্য সময় কেটেছিল। তার বিস্তারিত বিবরণ এর পরবর্তী লেখায় করা যাবে। চলবে?



Fall hues - Mita Mitra

প্রশংসা

অরুপা রায়

কবিগুরুর কথায় “আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পূজার সময় এল কাছে”। ছোটো বেলা থেকেই আশ্বিন মাস মানেই চারিদিকে শিউলি মাখা একটা গন্ধ, কাশফুলের দোলা, ঢাকের আওয়াজ.. অনেক আয়োজন, , কারণ একটাই, "মা আসছেন" ।। দেশ অথবা বিদেশ, সব জায়গায় আপামোর বাঙালী জাতির এ এক অদ্ভুত মন ভাল করা অনুভূতি.

আর পাঁচ জন নারীর মতই আমার দিবা রাত্রি, মাস বছর কাটে সংসার সামলে, সন্তানের দেখভাল করে, তার ওপরে অফিস এর চাপ তো আছেই । ছোট বেলা থেকে নিজের মা কে দেখেছি কিভাবে হাসিমুখে নির্দিধায় সংসার সামলে সকলের খেয়াল রেখেছেন। মা কে আদর্শ মেনে আমিও সেই পথে হাঁটতে শিখেছি।

এমন এক ছুটির দিনের সকালে বাড়িতে এক হৈঁহৈ কান্ড। অনেক দিন পর আমাদের এক অতিথি আসবেন সপরিবারে, তারই আয়োজনে তৎপর সকল। আগেভাগে ঘর গুছিয়ে রান্নার মেনু ঠিক করতে করতেই অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। সর্বনাশ! একদিকে ছোটো মেয়েকে খাওয়ানোর টাইম পার হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে বড় মেয়ের সাইন্স প্রোজেক্টটাও আজ না শেষ করলেই নয়। সন্কেবেলা লোকজন এলে তো আবার তার লেখাপড়া শিকেয় উঠবে। অগত্যা দুজনকে একসাথে নিয়ে বসলাম।

সকাল থেকে বার দশেক বলা সন্তেও এতক্ষন চোখে চশমা এঁটে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে বসেছিলেন আমার কত্তামশাই। হঠাৎ তাঁর টনক নড়ল বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, কাজেই বাজারের লিস্ট এবং বাজারে পরে যাওয়ার জামা প্যান্ট টিও তাঁকে এখনই বের করে দিতে হবে। এতোদিকের কাজ একাহাতে সামলাচ্ছি দেখে, আমার বড়ো মেয়ে বলে উঠল, “মা তুমি তো দেখছি দুর্গা মার মতই দশ হাতে কাজ করছো।” জীবনে এত বড় প্রশংসা পেয়ে শত ব্যস্ততার মধ্যেও ভারী আনন্দে মনটা ভরে উঠল আমার, চিকচিক করে উঠল চোখের কোনটা। নিজের মেয়ের কাছে এত বড় উপাধি পেয়ে মনে

মনে সেদিন খুব খুশি হয়েছিলাম আর বুঝেছিলাম রাতে শুয়ে মেয়েদেরকে শোনানো মা দুর্গার গল্পগুলো ওদের মনে কতটা দাগ কেটেছে। আশ্বিন মাসের এই দুর্গোৎসব আমাদের জীবনে এতটাই ভূমিকা রাখে যে যুগ যুগ ধরে এর ঐতিহ্য এবং পরম্পরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বয়ে চলেছে।

আসলে প্রতিটি নারীর মধ্যেই থাকে ভিন্ন গুণ। কখনো কেউ প্রশংসিত হয়, আবার কারো গুণ কখনো প্রকাশ্যেই আসেনা। সকল নারীই দশভূজা এবং সয়ংসম্পূর্ণা তার নিজের মত করে।

এই অশ্বিন মাসে মা দুর্গার স্মরণে বলি, "যদি অন্যের প্রশংসা করতে পারি, তাহলেই এই পৃথিবী হবে সুন্দরময়"



দশভূজা - Arupa Ray

কচি কাঁচাদের পাতা



Ariana Jain (6 yrs)



Shravya Sharma (7 yrs)



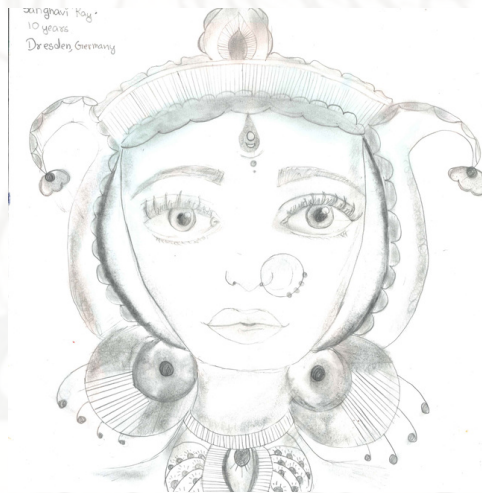
Snigdha Saha (8 yrs)



Tukwila Rahman (9 yrs)



Aavisha Dey (6 yrs)



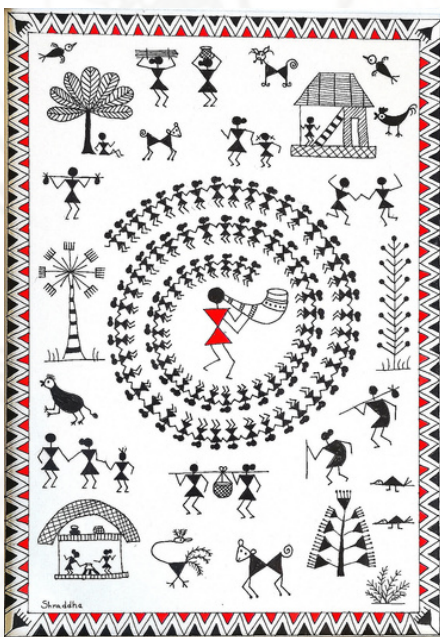
Sanghavi Ray (10 yrs)



Aavisha Dey (6 yrs)



Strength -Nafisa Anjum



Warli -Shraddha Lambe



Comfort -ManishaBera (15yrs)

শব্দছক
অর্ক বক্রী

১			২		৩			৪			৫			
														৬
			৭			৮					৯		১০	
									১১					
১২				১৩									১৪	১৫
							১৬							
	১৭				১৮					১৯				
২০			২১					২২						
					২৩	২৪								
২৫				২৬				২৭						
			২৮			২৯						৩০		
	৩১							৩২		৩৩				
			৩৪					৩৫				৩৬		
									৩৭		৩৮			
৩৯						৪০					৪১			

পাশাপাশি:

- ১ ষষ্ঠীর পুজোতে হয় বোধন আমন্ত্রণ ও _____
 ৩ দ্রাস্ত গণেশ পত্নী
 ৫ যে দেবতার পুজো সবার আগে করতে হয়
 ৭ পুজোর সময় যাদের দর বেড়ে যায়
 ৯ মা কালী যে ফুলে সন্তুষ্ট
 ১১ পরোটাটা মুচমুচে হবে আর এতে লেবু লক্ষা চললেও সসটা ঠিক চলে না
 ১২ পুজোর ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখে আমাদের সকলের যা হয়
 ১৩ _____ - এর শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির
 ১৪ বলি ফুল কিন্তু আসলে ঘাস। পুজোর সূচনা এরই দৃশ্যে
 ১৬ দেবীর গজে আগমন হলে এটি ভালো হয়
 ১৮ এর অরিজিনাল থিম 'বাঁশ-কাপড়'

- ২০ প্রত্যেক বছর দেবী দুর্গার হাতে যে বেদম প্রহার পেয়ে থাকে
 ২২ দেশ, আনন্দবাজার, প্রত্যেক বছর বার করলেও, BUDর জন্য প্রথমবার
 ২৩ আলুর দম বা কষা মাংস - সবের সাথেই এটা খুব ভালো যায়, তবে বাঙালি করতে হলে ময়দা ছাড়া কোন গতি নেই
 ২৫ পূজো যেন এক _____ য় কেটে যায়
 ২৮ _____ -এ কাঠি না পরলে পূজো শুরু হয়েছে মনেই হয় না
 ২৯ তামার চাকতির ঘণ্টা
 ৩০ চন্দ- মুণ্ডের সংহারিনী দেবী
 ৩২ হাঁড়ির মধ্যে গরম চানাচুর দেখতে পেলে পূজোটা জমে যায়
 ৩৪ চালের গুঁড়ো দিয়ে দেওয়া উচিৎ কিন্তু সময়ের সাথে সাদা পোষ্টার রঙও চলে
 ৩৫ কালীঘাটের বিখ্যাত শিল্পী
 ৩৬ লক্ষ্মী দেবির আরেক নাম
 ৩৭ পূজোর আগে এমন সাদা শক্ত চিনির মিষ্টি
 ৩৯ মহাদেব অল্পতে তুষ্ট - তার মধ্যে এটি প্রধান
 ৪০ বড়দের প্রণাম ও ছোটদের ভালোবাসা - এই দিনে কথাগুলো বেশি শোনা যায়
 ৪১ ঘটের দড়ি

উপর নীচে:

- ১ বাঙালির দুর্গাপূজোর আরেক নাম
 ২ অষ্টমী শেষ ২৪ মিনিট আর নবমীর প্রথম ২৪ মিনিটে যে পূজো হয়
 ৪ থ্রি নাইন ও থ্রি নাইন এইট টু জিরো - ফেলুদার ভক্তরা ঠিক ধরে ফেলবে
 ৫ যা ছোটলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায়
 ৬ আতপ, বাঁশকাঠি, সিদ্ধ, গবিন্দভোগ - _____ অনেক প্রকারের হয়
 ৮ পিতৃপুরষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন
 ১০ দাদা, ভালো করে ঝাল দেবেন। আরেকটু নুন লাগবে। একটা ফাউ ও দিতে হবে
 ১৩ এটা ছাড়া বাঙালি জীবন অচল। সঙ্গে চা আর টা থাকলে তো কথাই নেই।
 ১৫ _____ দীনর্ত পরিত্রাণ পরায়নে, সর্বসার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে
 ১৬ এগুলো কেটে প্রসাদে দেওয়া হয়
 ১৭ দেবীর হাতে যে প্রাণীটি থাকে তার আরেক নাম
 ১৯ আসছে বছর _____ হবে
 ২০ পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনা
 ২১ দেখো মা, সব কিছু যেন _____ হয়
 ২৪ “বলো দুগ্লা মাইকি, জয়!” - আমরা এটা যেভাবে বলি
 ২৬ _____ - জমক টা এবার ভালই হয়েছে
 ২৭ দরজার দুপাশে কলাগাছের সাথে আর যা রাখা হয়
 ৩০ এক ধরনের গরুর ল্যাজের লোম থেকে এটা বানানো হয়
 ৩১ ছোটবেলায় মার আঁচল দিয়ে পা ঢাকতে হতো এটা নেবার আগে
 ৩৩ লাল পাড় সাদা শাড়ী
 ৩৪ Nailpolish এর আবির্ভাবের আগে বাঙালি সধবাদের পায়ে যা শোভা পেতো
 ৩৫ যারা ঠাকুর গড়ে বা কাগজে পুরাণের গল্প অঙ্কন করে
 ৩৮ গাঁদার দিয়েই সব থেকে বেশি বানানো হয় তবে দেব দেবী বিশেষে অন্য ফুল ও লাগে যেমন শিবের জন্য আকন্দ

(Solution on Page 58)



Expressions- The lush green hills with the majestic Himalayas in the back have a divine influence on the art and culture of this region. The dance and songs are mostly dedicated to Gods in both Buddhism and Hinduism. Some of popular Nepali folk dances include Maruni, Dhan, Jhankri, Jatra and Damphu. Nepali folk-dance festival, Darjeeling, West Bengal, 2012.

- Binit Syamal



Reflection- Do we actually see ourselves when we look in the mirror?

- Writam Banerjee

শারদীয়া

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

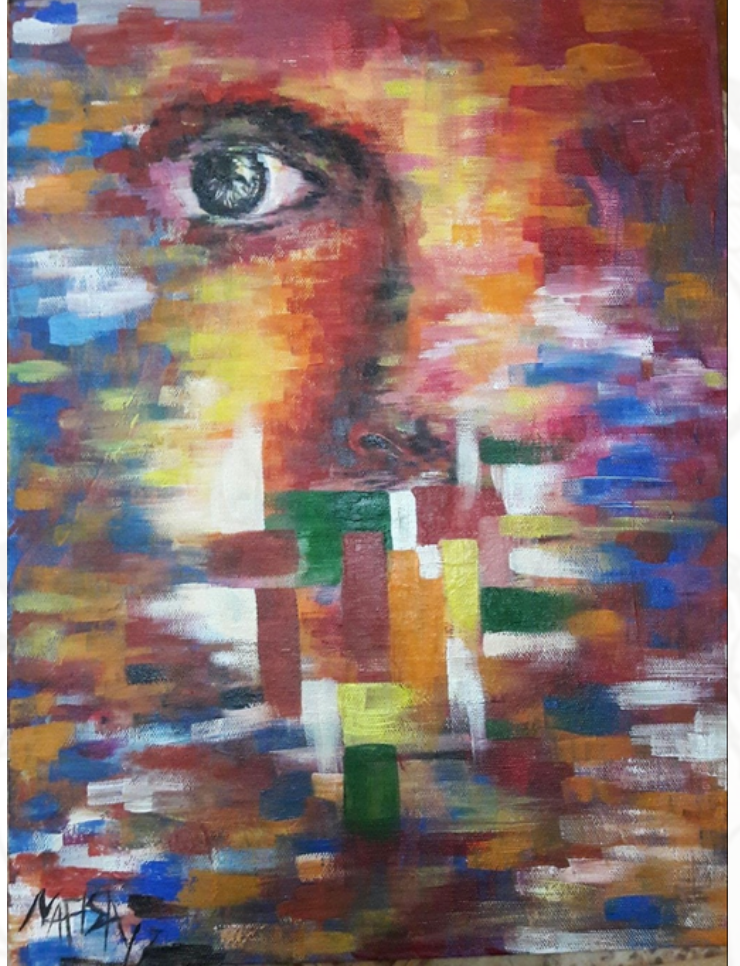
খেয়া বেয়ে যাই --
আমার ঘরের দেশে,
শীর্ণ জলের স্রোতে চোখ ঐঁকে
উপরে তাকাই।
খেয়া বেয়ে যাই।

চেউ যায় পায়ের পাতা ছুঁয়ে।
ছোট্ট কুঁড়ের কাছে যেখানে,
আলগোছে চোখ মোছে
স্মিত-শিউলি-ভোর --
সেইখানে জমা রেখে কিছু আলতা-রেখা,
খেয়া বেয়ে যাই।

ঘর থেকে সরে গেলো বাসা।
চালচিত্রে বদলায় সব।
সরু মেঠো পথ,
ক্লান্ত হয়ে রাস্তা খোঁজে
ক্লান্তিহীন ব্রহ্ম রাজপথে।
সে পথের ধারে,
কুণ্ঠিত কাশফুলে চাঁদমালা ঐঁকে
খেয়া বেয়ে যাই।

বাসা থেকে বাসা সরে যায়।
নীল চোখ ছায়া ফেলে
পশ্চিমের জলে।
সেই জলে পাণিশঙ্খ ভরে,
গির্জার ঘন্টায় জমা হয় আরতির ঘ্রাণ।
তারই রেশ মেখে,
খেয়া বেয়ে যাই।

খেয়া বেয়ে যাই--
আঁকা বাঁকা জলে,
ডাকের সাজের মতো ভেসে চলে
আগামীর মুখ।
আধো আলো আধো ছায়া আধো কুয়াশায়--
উপরে তাকাই।
খেয়া বেয়ে যাই।



অপেক্ষা - Nafisa Anjum

আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ- দক্ষিণ কোরিয়া

পৌলমী চৌধুরী

কোভিডের ভয়াবহতার মাঝে নিজের তথ্য প্রযুক্তি জীবনের থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম দক্ষিণ কোরিয়ায়, আমার স্বামীর কর্মস্থলে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, আর তাদের অজানা সংস্কৃতিকে জানার উৎসাহ উদ্দীপনা তখন তুঙ্গে, সাথে নিজের পরিজনদের ফেলে আসার চাপা কষ্ট। ওখানে পৌঁছানোর পরে জানতে পারলাম আমরা চোদ্দো দিনের পৃথকীকরণে গৃহবন্দী। মনটা দমে গেল যখন শুনলাম আর কোন মানুষের দেখা পাবনা সামনের চোদ্দো দিন। দক্ষিণ কোরিয়া গভর্নমেন্টের কড়া বিধিনিষেধে আমাদের বন্দীদশার সূচনা। এই চোদ্দো দিন দরজার বাইরে আমাদের প্রয়োজনের জিনিস সময়ে চলে আসত, কখনো আমাদের দেশের বন্ধু, আর বেশিরভাগ সময় বাড়ির মালিক Mr and Mrs. Park -এর সৌজন্যে। সেদিন বুঝিনি এই দুই জন বিদেশী-ই আমাদের দক্ষিণ কোরিয়ার অভিভাবক হয়ে উঠবেন। ওনাদের ভারত আর ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি ভালোবাসা আজকের নয়। ওনাদের কাছেই জানতে পারি এক ভারতীয় রাজকুমারীর দক্ষিণ কোরিয়ার রাণী হয়ে ওঠার গল্প।

কথিত আছে তেরশ শতাব্দীতে অযোধ্যার রাজকুমারী শ্রীরত্না - র মাত্র ষোলো বছর বয়সে দক্ষিণ কোরিয়া পাড়ি দেওয়ার গল্প। যিনি পরবর্তীতে দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন রাজা সুরো - র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বৈবাহিকসূত্রে রাজকুমারী শ্রীরত্না পরিচিত হন Heo Hwang - OK নামে। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েক মিলিয়ান জনসংখ্যা রানী শ্রীরত্নার প্রত্যক্ষ বংশধর। ভারতের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার এই রক্তের সম্পর্কের ধারণা আমার ভাবনাভীত। হয়তো কোথাও গিয়ে দেশকালের গন্ডি পেরিয়ে আমরা সবাই এক।



Pohang-si Yeongildae beach, South Korea - Poulami Chowdhury



Mr. & Ms. Park, Bogyangsa temple, Pohang-si - Poulami Chowdhury

দক্ষিণ কোরিয়ার এই বিদেশী দুই অভিভাবক আর তাদের অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসায়, ভারতের এই দুজন মানুষ এক আত্মীয়তায় জড়িয়ে পড়েছিল অজান্তেই। আর হয়ত কোনো দিন দেখা হবে না সুন্দর পোহাং শহর, ঘন নীল সমুদ্রতে ঘেরা ইয়েংগিলে সৈকত, বোগইয়ংসা মন্দির কিন্তু স্মৃতিতে তারা সারা জীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।



'রাঙিয়ে মোরে গেলে চলে, পিছন ফিরে দেখতে যদি, বুঝতে তবে হৃদয় মাঝে, সে রঙ কী হলো স্থায়ী'
-Tanmoy Sarkar

পিংলার অদ্ভুত স্বপ্ন

পাপিয়া দাস

পিংলা - আমার ক্লাসমেট এবং এখন আমার অফিস কলিগ ও বটে। ওর নামটা যত অদ্ভুত, তার থেকেও ওর চেহারা এবং ওর স্বপ্নগুলো আরো বেশী ইন্টারেস্টিং। গায়ের রং বেশ ফর্সা, রোগা আর মাথায় ঝাকড়া চুল। আমার লাইফ এ কোনোদিন ওকে হাফপ্যান্ট পরতে দেখিনি, বরাবর ফুলপ্যান্টই পরে - তবে গোড়ালির একটু উপরে। গলায় কালো একটা পুথির মালা নেকলেস এর মতো আটকানো আর চোখগুলো পৃথিবীর সবকিছু বেশী করে বোঝা বা জানার জন্য ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে - এ চেহারা একবার কেও দেখলে, চট করে ভুলতে পারবেনা। ওর ভালো নাম সাত্যকি বসু। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মাস ছয়েক হলো ব্যঙ্গালোরে বদলি হয়ে এসেছে। আর আমি? - নবাবগঞ্জ চ্যাটার্জী, ছাপোসা বাঙালী। বউ আর তিন বছরের মেয়ে নিয়ে দুবছর হলো ব্যঙ্গালোরে আছি HCL এ। ফ্যামিলি লাইফ আর অফিস লাইফ-এর জঁাতাকলে একরকম মেশিনের মতোই পাংচুয়াল একটা লাইফ চলছিল, - এই ছমাস ধরে পিংলা আমাদের অফিস-এ জয়েন করায় আবার যেন সেই ছোটবেলাটা কিছুটা হলেও ফিরে এসেছে। তার কারণ পিংলা আর ওর রাতের স্বপ্ন! আমিই যেহেতু ছোটবেলা থেকে ওর স্বপ্নের শ্রোতা, তাই মনে হল বয়েসের সাথে ওর স্বপ্নরাও আরো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। আমার লেখার উদ্দেশ্য পিংলার স্বপ্নগুলোকে ম্যাগাজিনের পাতায় ভরে লোকের মনের কোনে পৌঁছে দেওয়া।

পিংলার লাস্ট স্বপ্ন - *যমলোকে সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং*

রাতে ঘুমানোর আগে বিছানায় পিংলার চাই ল্যাপটপ, দাদুর লাইব্রেরি থেকে কোনো একটা বই আর ছোট এক পেগ হুইস্কি। সেদিন রাতে বিছানায় হ্যালান দিয়ে বইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হলো দমবন্ধ করা কোনো একটা জায়গায় চলে এসেছে, চারিদিকে অনেক লোকের ভিড় কিন্তু এদের কাওকেই পিংলার চেনা বলে মনে হলো না। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে এমন সময় পেছন থেকে ডাক! 'ও পিংলাদা তুমি এসে গেছ! আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।' পিংলার হঠাৎ মনে হলো এটা তো মদনদা, ট্রেন-এর হকার, মটর ভাজা, ছোলা-সেদ্ধ না কি সব বিক্রি করত। কিন্তু লোকটা যতটা আগ্রহ ভরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে এত পরিচয় তো কখনো ছিল বলে পিংলার মনে পড়ছে না। একটু হতভম্ব হয়েই পিংলা জানতে চাইল, "আচ্ছা এ জায়গাটা কোথায়? আর আমার জন্যই বা আপনি ওয়েট করছেন কেন?"

মদন দা একটু দাঁতো হাসি হেসে বলল, "আরে! এটা তো যমলোক! কিছুদিন হল আমি এখানে এসেছি, আর এসেই চারিদিক দেখে শুনে আমার বেশ খারাপ অবস্থা"। "গোড়া থেকেই বলি তোমাকে", বলে মদন দা শুরু করলো - "তুমি তো জানতে আমি ট্রেন-এ হকারি করতাম। বারকয়েক ছোলা-সেদ্ধ কিনতে গিয়ে তুমি কাঁচালংকা আর লেবুটা বেশী করে চাইতে সেকথা মনে আছে বৈকি! তো বুঝলে, বউ -ছেলেপুলে নিয়ে অভাব অনটনে দিন চলছিল আর কি! বৌএর গজগজানি, ছেলে-মেয়েদের পড়ার খরচ, একটু বেশী রোজগারের আশায় ঘুরছিলাম। একদিন আমার শালা এসে বলল ওর এক বন্ধু কোন এক নেতার ডান হাত হয়েছে, তো বুঝতেই পারছ একটু ধরাধরি করে বড় শপিংমল

এর পাশে একটা ঘুমটি বসিয়ে দিলো। কি বলব দাদা যে মটর ভাজা - ছোলা ভাজা বেচতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে যেত, পায়ের ঘাম মাথায় উঠত - সেই পাঁচটাকার ভাজা! শুধু প্যাকেটের চাকচিক্য পাল্টে ৫০ -১০০ টাকায় অনায়াসে বিক্রি হতে লাগলো। সেখান থেকে সিন্ডিকেট আর সবশেষে প্রমোটারী। কাঁচা-পয়সা, মদ, মেয়েমানুষ, লোকঠকানো! পাপ একেবারে গলা অন্দি উঠে গেছিল। একদিন আমার ব্যবসার পার্টনার বন্ধু দিল দুই গুলিতে সাবার করে। আসলে এসব লাইন এ তো আর বন্ধু হয়না, সবাই শালা! নিজের ছাড়া কিছু বোঝেনা। মাঝে মাঝে ছেলে, মেয়ের কথা ভাবলে হেবির মনখারাপ হয় মাইরি। শালা! আমাকে তো মারলো আবার আমার টাকা গুলোও মারলো। আর আমার কি বা করার আছে বলো! ওদিক তো আর কিছু করা যাবে না। যম-ব্যাটা, এনে দাড় করিয়ে দিল লাইন-এ, কিন্তু দুনস্বরীটা রক্তের এত ভেতরে ঢুকে গেছে যে এখানে এসেও ভদ্র, সভ্য হয়ে লাইন দিয়ে বিচার নিতে ইচ্ছা হলো না।"

পিংলা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, হঠাৎ চোখ দুটো কুঁচকে বলল, "তো তুমি কি করলে?"

মদন দা ফের গর্বের সুরে বলতে শুরু করলো, "বিজনেস করতে গিয়ে লোককে যেমন বাড়তি সুযোগ-সুবিধার টোপ দিতাম, তেমনই এক ব্যাটা কে পেয়ে গেলাম, আর ওকে আমার লাইনটা রাখতে বলে সাহস করে এখানকার ব্যাপার স্যাপারগুলো একটু বুঝতে বেরিয়ে পড়লাম। চারিদিকে শুধু লাইন, ভিড়, চাঁচামেচি, দুর্গন্ধ সেসব পেরিয়ে পেয়ে গেলাম কালো পাথরে মোড়া বিরাট অট্টালিকা। কেও কোথাও নেই, দেয়াল জুড়ে পাথরে খোদাই করা ভয়ংকর মূর্তি আর সারে সারে মশাল জ্বলছে - বুঝতে অসুবিধা হলো না এটাই মৃত্যুপুরীর অফিস। একটু ভয়ও লাগছিল, তাও সাবধানে এগিয়ে চললাম। তবে আমাদের দেশের মতো এতো থ্রিল, তালা, সিকিউরিটি এসবের তো কোনো বালাই নেই, তাই অফিস ঘরে পৌঁছতে বেশি বেগ পেতে হলো না। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন লোক ঘাড় গুঁজে ফর্দ থেকে মিলিয়ে কি লিখে যাচ্ছে। আর একটি লোক কিসব ফাইল খুঁজে নিয়ে যে লোকটি লেখালিখি করছে তার পাশে গাদা করে রাখছে। তবে এত লেনদি প্রসেস, যে মনে হলো এরচেয়ে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা, সরকারি ব্যবস্থার লোকে দুর্নাম করে বটে, কিন্তু তার থেকেও এদের অবস্থা আরো বাজে। কিছুক্ষণ বাদে আরো একটি কালো পেলাই চেহারার মোটা গোফওয়ালা লোক বাইরে থেকে এসে আরো কিছু ফাইল দিয়ে গেল।"

এইসময় পিংলা জিজ্ঞাসা করে উঠলো, "আচ্ছা এরা কি সেই যমরাজ, চিত্রগুপ্ত?"

মদন দা একটু আনমনা হয়ে বলল, "হবে হয়তো। সে যাইহোক, আমি তো লুকিয়ে ওদের কাজকর্ম দেখছি, এমন সময় যে ব্যাটা ফাইল আনা নেওয়া করছিল, কি করে তার চোখে পড়ে গেলাম। খ্যাকখ্যাকে গলায় লোকটি চেচিয়ে বলল, তুই করে? আর ওই থামের পেছনে কি করছিস? আমার তো তখন গলা শুকিয়ে কাঠ! ভাবছি কি করব আর কি-ই বা বলব, ভুলেই গেছিলাম আমি কোথায় এসেছি! তখনি লোক বেচে খাওয়ার ফন্দি একের পর এক মাথায় এসে গেল। ট্রেন-এ হকারি করেছি বলে নেতাদের মতো একটানা ভাষণ দিতে কোনো সমস্যা হলো না। আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম 'মুদ্র-ত্যাগ' এর জন্য জায়গা খুঁজতে আমার এখানে এসে পড়া। ওদের কথাটা কতটা বিশ্বাস হলো জানি না! যে লোকটি গদির মতো জায়গায় বসে মিলিয়ে মিলিয়ে কি সব লিখছিল, সেই আমাকে পা থেকে মাথা অন্দি এক ঝলক দেখে নিয়ে অন্য লোকটিকে আমার নাম-এর ফাইলটা নিয়ে আসতে বলল।" এই সময় মদনদা একটু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "যে কাজের জন্য তোমার কাছে

আসা সেটা তোমায় করে দিতেই হবে। তাহলে যদি নিজের কষ্টের লিস্টটা একটু কমাতে পারি।"

পিংলা অবাক হয়ে বলল, "কষ্টের লিস্ট মানে! তোমাকে কি ওরা গরম তেলে ভাজবে?"

মদন দা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে ওসব তোমাদের যত ভুলভাল ধারণা। পাপ-পুণ্যের ফর্দ বানিয়ে সেট করতেই অবস্থা খারাপ, তার মধ্যে আবার তেল, কড়াই, উনুন - কি যে বল!"

পিংলা বলল, "তাহলে?"

এবার মদন দা মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল, "ওরা যখন আমার ফাইলটা আনলো, আর চার্টের সাথে মেলাতে বসলো তখন বুঝলাম আসল রহস্যটা কি? পাপ-পুণ্যের টাইপটা যেমন হবে: কম, বেশী, মাঝারি সেই অনুযায়ী আমি জন্মাব। এই ধরো কীট-পতঙ্গ, মশা, মাছি, পাখি, মাছ, বনের শান্ত পশু, হিংস্র পশু, ঠান্ডার দেশের গাছ, গরমের দেশের গাছ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল মানুষ, কঠিন দুর্ভাগ্যে পড়া মানুষ, শেষে ভালো মানুষ আর সবশেষে মিলিয়ে যাবে!"

পিংলা অবাক হয়ে বলল, "মিলিয়ে যাবে মানে?"

মদন দা বলল, "মানে আমাদের দেহ যে সব বস্তু দিয়ে তৈরী যেমন - জল, আগুন, বায়ু এইসব - এই বস্তুগুলো জোড়া লেগে আবার নতুন প্রানের সৃষ্টি হবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা মিলিয়ে যাবে। তবে মানুষ ছাড়া অন্য জন্মে কোনো রিস্ক নেই, কারণ মানুষ-ই কেবল চিন্তা করতে পারে আর ভালো মন্দের বিচার করতে পারে।" এইসময় মদন দার কথাগুলো বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো শোনালো!

কিন্তু পিংলার মনে অনেক প্রশ্ন, নিজেকে আর থামাতে পারছে না। সে বলে উঠলো, "আচ্ছা পাখি আর গাছ তো বেশ ভালই তাইনা!"

মদন দা বলল, "শুধু ভালো কেন হবে খারাপ ও তো আছে। দেখনা, কত পাখি কে আমাদের মতো মানুষেরা খাঁচায় ধরে রাখে, চাইলেও উড়তে পারেনা। গাছকে কাটছি দিনের পর দিন, দাবানলে পুড়ছে কখনো তাও পালাবার উপায় নেই! জানো পিংলাদা - ফাইলে প্রথম দিকে আমার জন্য ভালো ঘরেই জন্ম, কর্ম ছিল। আসলে ট্রেনে যখন হকারি করতাম, পয়সা কম ছিল, দিন এনে দিন খেতাম কিন্তু অসৎ ছিলাম না। পয়সা আর ক্ষমতার লোভ আমাকে মানুষ থেকে একেবারে মশা-মাছি তে প্রায় নামিয়ে দিল। আবার কত জন্ম পেরোলে উদ্ধার পাবো কে জানে! তা যখন ওই যম আর চিত্রগুপ্ত - না কি নাম বলছ, তারা যখন আমায় ধরে ফেলল, আমিও ভয় পাবার ভান না করে বলতে লাগলাম, বাইরে মানুষের লাইন বাড়ছে আর ধৈর্য ও কমছে। কখন এরা স্ট্রাইক করে বসে বা গন্ডগোল শুরু করে তাই আমার মাথায় একটা আইডিয়া এলো সেটাই আপনাদের বলতে চাই। তাহলে আপনাদের ও একটু চাপ কমে আর কি! বুঝলে পিংলাদা, এইসময় ওদের একটু মুখটা ব্যাজার হয়ে উঠলো। ওদের একজন বলতে শুরু করলো, কথাটা তুমি মন্দ বলো নি। তোমাদের তো আবার জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপার আছে আর এই প্রক্রিয়ার ফলে তোমরা একটু বিশ্রাম ও পাও কিন্তু আমাদের তো সে সবার কোনো বলাই নেই। কবে থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে তাই ভুলতে বসেছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কতো যে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র তার কোনো আদি অন্ত নেই। এই চক্র একদিকে ধ্বংস হবে আবার অন্য দিকে শুরু হবে। তাই যুগের পর যুগ আমাদেরও কোনো ছুটি ছাটা নেই। তা বাপু তুমি কি সব মতলবের কথা বলছিলে? এইসময় আমার শুকনো গলাটা একটু ভিজে উঠলো, সাহস করে বললাম আমাদের পৃথিবীতে মানুষরা এখন অনেক উন্নত হয়ে গেছে চিন্তা ভাবনায়। এই আজকাল কম্পিউটার আর ইন্টারনেট এর যুগ চলছে, আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রা এমন সব প্রোগ্রাম বানাচ্ছে যে নিমেষে সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। আর আপনাদেরতো সামান্য হিসাবপত্রের ব্যাপার। একবার প্রোগ্রাম সেট

হয়ে গেলে শুধু ছুটি-ই ছুটি, চলুক না যতকাল ধরে খুশি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্দ। এইসময় চিত্রগুপ্ত কোমরের গাউনটা একটু পেটের উপরে তুলে নিয়ে বলল, মতলবটা মন্দ নয়। তা আছে নাকি কেও তেমন জানা শোনা? বুঝলে পিংলাদা, এইসময় হঠাৎ তোমার নাম মনে পড়ল।"

পিংলা চোখগুলো গোল গোল করে বলল, "এই পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমাকেই তোমার মনে পড়ল কেন শুনি ?!"

মদনদা একটু ঢোক গিলে বলল, "না, ট্রেন এ যখন তোমায় দেখতাম তখন তো আর জানতাম না। পরে যখন সিন্ডিকেট, প্রমোটোরী এসবে জড়িয়ে পরলাম তখন দেখলাম নিউটাউন, সেক্টরফাইভ এর অঞ্চলগুলোই আমাদের মতেন লোকেদের রাজত্ব। সেখানেই বেশ কয়েকবার তোমাকে দেখেছি আর বন্ধুদের সাথে কথা বলতেও শুনেছি। আর মাইরি বলছি পিংলাদা, তোমার চেহারাটা এমন প্যাটকা মতো যেন ঝড়ে উড়ে এসে জামাকাপড় একটা লম্বা পাটকাঠির গায়ে আটকে গেছে, এর মধ্যে তোমার নিজের ফ্যাসান জুড়ে যা অবস্থা! এই চেহারা সহজে ভোলা যায়?"

এতক্ষণ বেশ মন দিয়েই সব শুনছিল, কিন্তু নিজের চেহারার তাচ্ছিল্য শুনে পিংলা রেগে গিয়ে বলল, "আমি তো এখনো মরিনি। যম কে দিয়ে তুমি আমাকেই বা কেন তুলে আনালে, আমি চললাম, খুঁজে বার করো তোমাদের এই যমলোকেই কাউকে।"

এই সময় মদনদা নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাঁদো কাঁদো হয়ে পিংলার পা চেপে ধরল। "তুমি বাঁচাও আমায় পিংলা দা, নাহলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে। আমি ওদের কথা দিয়ে এসেছি।"

পিংলা আরো রেগে গিয়ে বলল, "আরে ছাড়! আমায় ছাড় বলছি, সুড়সুড়ি লাগছে ছাড় ...উ:"

...কিন্তু সুড়সুড়িটা নাকের কাছে লাগছে কেন? আর মদনদার গলাটাও হঠাৎ মাছির পোঁ পোঁ আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে কেন? হাতটা নাকের কাছে যেতেই পিংলার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আর মাছিটা তখনো পোঁ পোঁ আওয়াজ করে ওর মুখের চারিদিকে ঘুরে যাচ্ছে। খবরের কাগজটা তুলে হাওয়া দিতেই মাছিটা জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে পিংলার মনে হতে লাগলো ওটা কি সত্যি মাছি ছিল?না, মদন দা.?.....না স্বপ্ন!!!



Descending into hell - Poulami Chowdhury



চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন - Tanmoy Sarkar



'চপল চরণ মনোহরণ সোনার হরিন চাই' - Koushiki Chattopadhyay

তুষার স্থাপত্যের আহ্বানে ঋতম ব্যানার্জী

আমাদের ট্রেনটা ঠিক দুপুর ১ টা বেজে ১৭ মিনিটে হারবিন স্টেশন পৌঁছাল। সারবিয়া অঞ্চলের ছোট্ট একটা শহর হারবিন। স্থানটি রাশিয়া সীমান্তের কাছাকাছি, চিনের অন্তর্গত। তাই স্বভাবতই চৈনিক পরিব্রাজক এবং স্থানীয় লোকজনের সংখ্যাই বেশি হয় এই জানুয়ারী মাসে। কারণ এই সময়টায় এখানে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য 50°C হলেও তাপমাত্রার মাপকাঠি শুরু হয় হিমাক্ষের 5° ডিগ্রি নীচে। তাই বছরের এই সময়ে ভ্রমণকারীর সংখ্যা কমই থাকে।

আমি আর আমার দুই বন্ধুর উদ্দেশ্য Harbin Ice and Snow Festival (HISF) ও Siberian Tiger Park (STP)। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে সোজা হোটেলের ভোজনালয়ে পেটপূজো সারলাম চৈনিক ডাম্পলিং, ছাওমিয়েন, ও কুমপাওচিতি সহযোগে। হোটেলের ঘরে ব্যাগপত্র রেখে যখন Sun Island Park পৌঁছালাম তখন দুপুর পৌনে তিনটে। বিশালাকার বরফের দরজা পেরিয়ে আমাদের তিনজনেরি চক্ষু চড়কগাছ অতিকায় বরফের স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে। তার কিছু উদাহরণ বন্দি করেছিলাম ক্যামেরায়।



HISF - Writam Banerjee

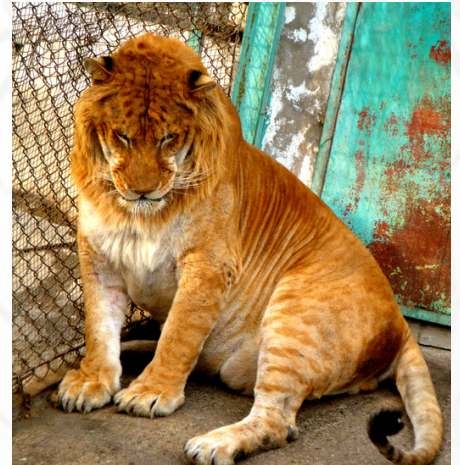
বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ রওনা দিলাম HISF উদ্দেশ্যে। কয়েকশ কুইন্টাল বরফ কেটে এমন নিপুণতায় ভরা স্থাপত্যের মাঝে আমার ছিলাম মন্ত্রমুগ্ধ, আর কুর্নিশ জানালাম শিল্পীর শিল্প সত্তাকে। আর এই ভেবে গর্ব হল যে পৃথিবী তুমি পরমা সুন্দরী হতেই পারো, কিন্তু তোমার রূপের শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ আমাদের মানে হোমোসেপিয়ানদের হাত ধরেই।

সমস্ত ভালোলাগা অচিরেই ধাক্কা খেল যখন শারীরিক অনুভূতি বাহ্যিক তাপমাত্রার আভাস পেল। হাতের গ্লাভস খুলে ফটো নিতে গিয়ে টের পেলাম যে মাএ ২০ সেকেন্ডেই আমার হাত অসাড় হবার উপক্রম হয়েছে। হবেনাইবা কেন? ফেস্টিভালের ভেতরের পারদ যে -৫৫°C তে ঠেকেছে। এই সময় এই অঞ্চলে সতর্কিকরন থাকে আমাদের মত বহিরাগতদের জন্য। তবুও স্মৃতির রঙিন প্রেক্ষাপটের উদ্দেশ্যে গুটিকয়েক ছবি তুলেই ফেললাম। হোটেলে ফিরে সফর বিধ্বস্ত শরীরটা বিছানার ফেলামাত্র আশ্রিত হলাম ঘুমের কবলে।



Ice Sculpture, HISF -Writam Banerjee

পরদিন সকালে রওনা দিলাম STP এর উদ্দেশ্যে। STP হল ৩৫০ একরে বিস্তারিত ন্যাশনাল পার্ক। এখানে শুধু হুস্টপুস্ট বাঘের সংখ্যাই হল ১৩০০। দর্শনার্থীদের একটি খাঁচার গাড়িতে করে ঘোরানো হয় বাঘমামাদের মাঝে। চাম্ফুস ১৩০০ না দেখলেও, যা দেখেছি তার সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। শুধু বাঘ তাদের খেলা, বা শিকার ধরাই নয়, STP-এ আরো বিচিত্র প্রাণের অস্তিত্ব সংরক্ষীত। লাইগার হল তেমনই এক উদাহরণ। যদিও মানুষের সৃষ্ট এই প্রজাতিকে দেখে কষ্টই বেশি হল কারণ এরা মানুষের বিফল পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদর্শন। কোন দোষ না করেও বিফলতার দায়িত্ব এরা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আর তা বহন করছে শরীর দিয়ে। সেদিন রাতটা হারবিনে কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা দিলাম পরবর্তী অভিযানের উদ্দেশ্যে।



Liger, STP -Writam Banerjee

দুই ছবির উপাখ্যান

পদ্মনাভ সেন



Rupin Pass, Himalaya -Padmanava Sen

'এটা তোমাদেরই জায়গা। আমাদের নয় !' এটাই মনে এসেছিলো। স্থান - রূপিন গিরিপথ (২০১৫)। ছবিটা তুলেছিলাম হিমালয়ের ১৫০০০ ফুট উচ্চতার এক গিরিপথে। পাসটি সাংলা উপত্যকা, হিমাচল এবং রূপিন উপত্যকা, উত্তরাঞ্চলের মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী শেফার্ড রুট। বিতর্কিতভাবে, এই পাসের সরস্বতী হিমবাহটি পুরানো সরস্বতী নদীর উৎস হতে পারে।

আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দু চার কথা বলি। সেই দিনে অনেকটা পথ উঠতে হয়েছিল আর অনেকটা নামতেও। আমাদের একটা ছোট দল এক পাহাড়প্রেমিক বাঙালি ট্রেক লিডার র সাথে উঠছিলাম। গিরিপথের জমা বরফ, ওঠা আরো শক্ত করে দিয়েছিলো। আমাদের যাওয়ার একটাই পথ ছিল, সেটা হল উপরে, নিচের দিকে না তাকিয়ে। আমরা কেউই নিচের দিকে তাকাইনি। আরোহণ করতে থাকলাম, মাঝখানের জমা বরফ এড়িয়ে, এক ধাপ করে। অনেক জায়গায় বরফের ঢালে কোনো স্থিতিশীলতা ছিল না। এক পর্যায়ে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আটকে যায়। এগোলেই পিছলে যাবো। তখনি একটা ভেড়ার পাল এল। ৫ মিনিটের জন্য, আমরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম, মনোযোগ হারিয়ে যাতা অবস্থা। কিন্তু ম্যাজিক র মতো তারা নিচে নেমে যেতে আমরা এক নতুন উদ্যম ফিরে পেলাম আর শেষ খাড়াই অংশটুকু উঠেও পড়লাম। উঠেই এই দৃশ্য। আরেক দল তৈরী। মনে হলো আগের দলটা আমাদের উদ্যম দিয়ে গেলো, দ্বিতীয় দল আমাদের স্বাগত করছে। ছবির উপরের দিকে দৃশ্যমান, মেঘ কিন্নর কৈলাস রেঞ্জের সাথে লুকোচুরি খেলছিল। শেফার্ড রুট ওদেরই !!



Pangong Lake, Ladakh-Padmanava Sen

যদি এভাবে আঁকতে পারতাম!! প্রকৃতিই সবার সেরা চিত্রশিল্পী।
আমার প্রথম লাদাখ ভ্রমণে, আমি হিমালয়ের এই মরুভূমির সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত এবং কিছুটা
আত্মহারা হয়ে গেছিলাম। 3 ইডিয়টস-র জন্যে হঠাৎ বিখ্যাত প্যাংগং হ্রদ থেকে ফেরার সময়, আমার
স্থানীয় গাইড এবং ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িটি থামিয়ে দেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এটাই আমার
আমার প্রিয় দৃশ্য হবে। তাই হয়েছিল। লোকেরা ভাবতে পারে যে গাছপালা কোথায়? দুটো কারণ।
এক, এটা মরুভূমি। দুই, এই ছবিতে দেখা সব কিছুই প্রায় ১৫০০০ ফুটের উপরে এবং এই উচ্চতায়
গাছপালার বাঁচা শক্ত। সবুজের (প্রকৃতিতে আমার প্রিয় রং) অনুপস্থিতি ভুলিয়ে দেয় নতুন নতুন রং
যার নাম আমার জানা নেই।



কাশের দেশে সূর্যোদয় - Sambrita Chowdhury

আজকে বিসর্জন

ঋতম ব্যানার্জী

মন, জলেভেজা এই মন, অবাক শ্রাবণ।

এই মন, যেন শুধুই আশার ক্ষণ,

আজকে বিসর্জন।

বৃষ্টি ভেজা আশ্বিনের

এই কাকভেজা শহর,

ক্লান্তি জুড়ায়, মাগো তোমার

আশীষেরি নাহর।

তোমার ইচ্ছেয় সবাই মিলে

জমায়েত এই ধরাতলে,

কাশফুলেরি শোভান্নিত

ঢাকের তালে মন যে দোলে।

আমার মন, উজানটানে সিন্ধু পানে,

পাল তুলে এখন।

এই মন, যেন শুধুই আশার ক্ষণ,

আজকে বিসর্জন।

ঐ মেঘের মুলুক পারে,

তোমার কৈলাশেরি ঘরে,

বহর, বহর, আসছে বহর

যাব তোমার অভিসারে।

কত শৈশব, কতবা দশক,

কতবা শতক ঘুরে,

আগুলিয়াছি তোমার ছোঁয়া

আমার মন-অঙ্গিনা জুড়ে।

এসেছ যখন যাবার তরে,

যেতেতো তোমায় হবেই।

অমরত্বের জীয়েন ছোঁয়ায়,

সময় সাগরেই।

তবুও তোমার রূপকথাতেই

সাজানো এই মন,

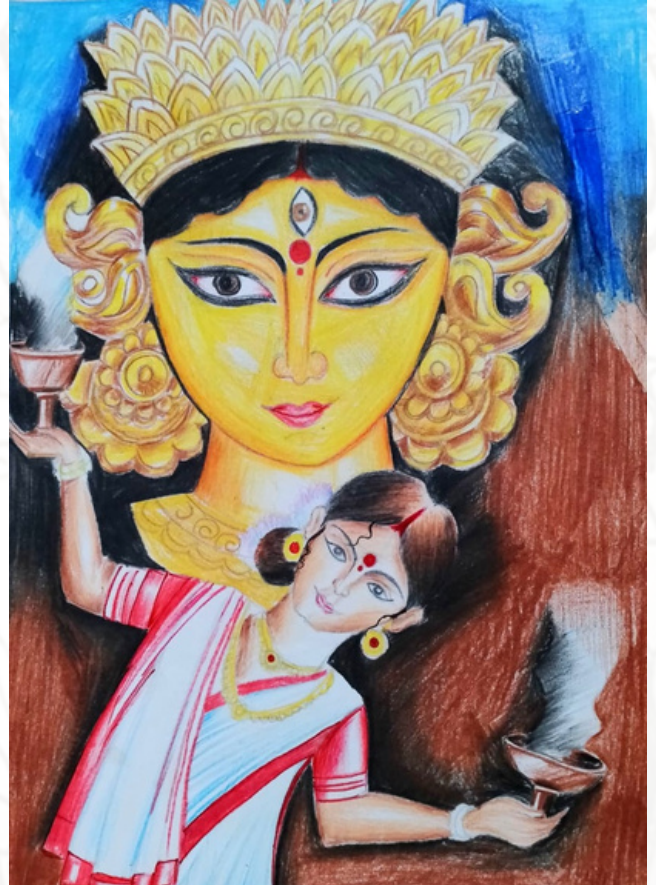
আসছে বহর আসবে মাগো

দিনগুনি প্রতিখন।

মন, জলেভেজা এই মন, অবাক শ্রাবণ।

এই মন, যেন শুধুই আশার ক্ষণ,

আজকে বিসর্জন।।



ওম, গচ্ছ গচ্ছ পরমস্থানম

স্বস্থানম দেবী পরমেশ্বরী

- Manisha Bera (15 yrs)

দূর পাহাড়ের হাতছানি

সৌরভ দেব

জার্মানির প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই নবাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজন করা হয় নানা ধরনের প্রোগ্রামের। TU Dresden এ যেটাকে বলা হয় ওয়েলকাম উইক প্রোগ্রাম। তারই আওতায় ১৮ অক্টোবর, ২০১৪ আয়োজন করা হয়েছিল হাইকিং প্রোগ্রামের, যার গন্তব্য ছিল ড্রেসডেন শহরের পাশেই অবস্থিত Saxon Switzerland - এই এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ক্লাইম্বিং এবং হাইকিং এরিয়া।

দিনের শুরুটাই হল বিপত্তি দিয়ে। তার আগের দিন হঠাত করেই রিজিওনাল ট্রেনচালকরা কর্মবিরতিতে চলে গেলেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় বেশির ভাগ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরাই মনে করল সম্ভবত এই প্রোগ্রাম হচ্ছে না। সৌভাগ্যবশত খবরটা আমার কানে পৌঁছায়নি। তা না হলে পরের দিন সকালে হয়ত ঘুমই ভাঙতো না আমার! সেইদিন রেলস্টেশনে গিয়ে খবরটা শুনেই হতভম্ব অবস্থা আমার! আরো বুঝতে পারলাম আমাকে নিয়ে ১৮ জনের দলে কেন আমিই একমাত্র নন-জার্মান। ধন্য সেই ১৭ জার্মান!! তারা জিদ ধরে ছিল। এই লাইনের ট্রেন বন্ধ তো কি হয়েছে? তারা যাবেই যাবে। আধা ঘণ্টা ধরে একে ওকে ধরে কিভাবে যেন অন্য একটা ট্রেনে উঠার অনুমতি ম্যানেজ করে ফেলল। এখানেও ছিল আরেক মজার ব্যাপার। আমাদের সাথে ইন্টারন্যাশনাল অফিসের যে দুজন প্রতিনিধি ছিল তারা ট্রেনের কর্মকর্তাকে কি বুঝিয়েছিল কে জানে, তিনি মনে হয় ধরে নিয়েছিলেন শুধু এই দুজনই যাবে। পরে ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন তিনি দেখলেন ২ জন না, ১৮ জনের রীতিমত বিশাল এক দল তখন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন তিনি। হুমকির সুরে অনেক কথা বলে বিদায় নিলেন। জার্মান ভাষায় যতটুকু দখল আছে তাতে করে যা বুঝলাম তা সহজ বাংলায় হল, “কাউকে যেন সিটে বসতে না দেখি। সবাই করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকো। একজনকেও যদি বসতে দেখি তাহলে সবাইকে পরের স্টেশনে নামিয়ে দিব।” অতঃপর সুবোধ বালক বালিকার মত সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম ট্রেনের করিডোরে।

অবশেষে প্রায় ২৫-৩০ মিনিট পর ট্রেন থামলো কাঙ্ক্ষিত স্টেশনে। জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে, যাকে বলে কান্ট্রিসাইড। আগে থেকেই অল্প অল্প শুনেছিলাম, এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি জার্মানির নয়নাভিরাম কান্ট্রিসাইডের এক নমুনা। স্টেশনের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে এলবে নদী। নদীর উপরের ব্রিজ দিয়ে হেঁটে অন্য পাড়ে দাড়ালাম আমরা। তার পরেই শুরু হল হাইকিং।

প্রথমে আমার অনুভূতি ছিল এরকম। মাত্র ৫৫০ মিটার। এ আর এমন কি? প্রথমদিকে আসলে কষ্ট তেমন একটা হয়নি। কারণ তখনো রাস্তা খুব বেশি খাড়া উপরে উঠতে শুরু করেনি। পাইন গাছের নিবিড় অরণ্যের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে মোটেও খারাপ লাগছিল না। নির্জন বুনো সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলছিল সবাই। যদিও আগের দিনের বৃষ্টিতে রাস্তা কর্দমান্ত্র হয়ে থাকার জন্যে একটু সাবধানে হাঁটতে হচ্ছিল। হঠাত মাঝে একটা যায়গায় দেখা গেল সামনে যাবার আর সোজা রাস্তা নেই। প্রায় ১৫-২০ ফুট গভীর একটা খাদ হয়ে গেছে। অন্য উপায় না দেখে শুরু হল খাদ ধরে নামা। মাটি পিচ্ছিল হয়ে আছে রীতিমত। নামার সময় এক পর্যায়ে ভারসাম্য

হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম।

সেই সময় সামনে একটা গাছের গুড়ি পড়ে থাকতে দেখে তার উপর পা ফেলে ব্যালেন্স ঠিক করার চেষ্টা করতে গেলাম। ফল হল ঠিক উল্টো। আমি জানতাম না, বৃষ্টিতে ভিজলে এই জাতের গাছ বরং আরো বেশি পিচ্ছিল হয়ে যায়। যা হবার তাই হল। পা পিছলে গেলাম পুরো। তবে ভাগ্য ভাল, আমার ঠিক পিছনে থাকা ছেলেটা সময়মত ধরে ফেলল আমাকে - না হলে, কাদায় গড়াগড়ি করে আমার সাধের টি-শার্ট আর জিন্সের অবস্থা হত করুণ।

খাদ পেরিয়ে পৌঁছানো হল অন্য পাড়ে। এবার মোটামুটি সমতল জমি দিয়েই কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া হল। এবার সামনে পড়লো কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুত করে রাখা বিশাল ভূমি। সেই সময় আমার পাশে হাঁটতে থাকা ডেব্রা বললো, “সামারে সময় নিয়ে কখনো এখানে আবার এসো। তখন এই জমিগুলোর দিকে তাকালেই দেখবে রঙের মেলা বসে গেছে যেন।” কথাটা শুনে মনে মনে কল্পনা করছিলাম সামারে আসলেই এই জায়গাটা কেমন দেখাবে তা। তবে কল্পনার দৌড় থেমে গেল একটু পরেই। কারণ, সামনে এবার পাহাড় খাড়া উপরে উঠতে শুরু করেছে। যত উপরে উঠছি, ততই যেন আরো খাড়া হয়ে উঠছে পাহাড়। দল থেকে একটু পিছিয়ে পড়লাম এবার। এবারের অনুভূতি হল, ‘নেহাত অনেক দিন পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস নেই, নাহলে জার্মানগুলোকে দেখিয়ে দিতাম, পাহাড়ে ওঠা কাকে বলে?’ তবে একটা কথা অস্বীকার করা যাবে না। যতই উপরে উঠছিলাম, ততই যেন আশপাশটা আরো বেশি সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হচ্ছিল আমার সামনে। এটাই হয়তো অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছিল সামনে এগিয়ে যাবার জন্য। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, এলবে নদীর পাড় থেকে যাত্রা শুরু করার পর অনন্তকাল কেটে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকাতাই বুঝতে পারলাম কেটেছে মাত্র সোয়া এক ঘণ্টা। আরো প্রায় ১৫-২০ মিনিট (আমার মনে হয়েছিল অন্তত আরো ১ ঘণ্টার বেশি) ধরে চড়াই পেরিয়ে পৌঁছালাম পাহাড় চূড়ায়। আর আচমকাই যেন প্রকৃতি অন্যরকম একটা রূপ নিয়ে ধরা দিল আমার চোখে। পাহাড় কিনারায় এসে দাঁড়ালাম।

এইদিক দিয়ে একদম রক্ষ পাথুরে রূপ নিয়ে সোজা নেমে গেছে পাহাড়টা। নিচের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে সরু ফিতের মত এলবে নদী আর তার পাড়ে ঘন সবুজের আচ্ছাদন। আর অন্যদিকে তাকালে দেখা যায়, জার্মানির নৈস্বর্গিক কান্ট্রিসাইড। ঠিক যেন ছবির মত। চোখ ধাঁধানো সূর্যালোক আর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ‘চাঁদের পাহাড়’ মুন্ডির সেই গানটা, “আকাশ হঠাত খুলে গেছে সূর্য সীমানায়/ অনেক দূরে পাহাড় চূড়ায় নতুন ঠিকানায়/ পায়ের নিচে অন্য মহাদেশ/ কে জানে তার কোথায় আছে শেষ”।

এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় ছিলাম সেখানে। এই সময়ে প্রকৃতি দেখার পাশাপাশি চলল লাঞ্চ সেরে নেয়া, ফটোসেশন ইত্যাদি। তারই মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিল আমাদের ভার্টিটিরই অন্য একটা গ্রুপ, যেটা এর আগের রাত থেকেই এখানে আছে ক্যাম্পিং করে। আমাদের ক্লাসের এক ইন্ডিয়ান ছেলে, এক চাইনিজ ছেলে আর এক তাইওয়ানিজ মেয়েকেও পেয়ে গেলাম সেই গ্রুপে। ক্লাসমেটদের পেয়ে এবার উপভোগ্যতা আরেকটু বাড়লো। ঘণ্টাখানেক পর শুরু হল নেমে আসার পালা অন্য আরেক রাস্তা ধরে। তারপর এলবের পাড় ধরে আরো এক ঘণ্টা হাঁটা চলল। এরপর হাজির হলাম এক গ্রামের প্রবেশপথে। আবার শুরু হল চড়াই ভাঙ্গা। ছবির মত সাজানো এই গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে

এবার আর কেন যেন আগের বারের মত ক্লাস্তি অনুভব হল না।

এখানে চোখে পড়ল প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের অনেক এন্টিক গাড়ি। গ্রামের পর আবার অরণ্য। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা এখানে। জগতের সব কোলাহল যেন আচমকা থমকে গেছে এখানে এসে, শুধু পায়ের নিচে বারা পাতার মর্মর ধ্বনি ছাড়া।

অবশেষে প্রায় বিকাল ৪টা নাগাদ শেষ হল যাত্রা। এবার ফেরার পালা। ক্লাস্ত শরীর ঘরে ফিরতে চায়। কিন্তু পাতা বারা বুনো পথের সৌন্দর্য্য, ধীরলয়ে বয়ে চলা এলবে নদীতীরের শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ আর দিগন্তবিস্তৃত সবুজের হাতছানি কেমন যেন একটা পিছুটান তৈরি করে। তাই, আপাতত বিদায় Saxon Switzerland, কিন্তু কথা দিচ্ছি আবার কোন এক সময় আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে।



'তোমার বীণার ঝঙ্কারে সে সকল ভুলে যায়,
তাকিয়ে শুধু তোমার পানে নৃত্যে বিভোর হয়'

-Prabhat Chowdhury

অচেনা পাহাড় - চেনা প্রিয়জন

পদ্মনাভ সেন

ভাবছিলাম ওর কথা আজ সবাইকে জানাবো কিনা। সাহস সঞ্চয় করে লিখেই ফেললাম।
৫ বছর আগের কথা। অনেকটা সময় হিমালয়ে কাটাতে কাটাতে স্পিতি উপত্যকা তে পৌঁছেছি তখন।
একই হাইকিং করা শুরু করে দিয়েছি। দেমুল (Demul) বলে একটা পাহাড়ি গ্রামে ৪ দিন কাটাবার
পর ইচ্ছে হলো কমিক যাই। কমিক (Komic) হলো ভারতীয় হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু গ্রাম যেখানে
গাড়ি পৌঁছায়। কিন্তু আমি যাবো পাহাড়ি পথে। বেরিয়ে পড়লাম কয়েকজন গ্রাম বাসি র সাথে কথা
বলে। এই এলাকাগুলোর উচ্চতা এতো বেশি আর লোক এতো কম যে পথে কাউকেই দেখতে পেলাম
না দেমুল র সীমা ছাড়বার পরে। কোথাও কোনো কিছু লেখাও নেই, কোনো মানুষেরও দেখা নেই।
ফোন এ সিগন্যাল দূরের কথা, ম্যাপে কোনো তথ্য নেই। আছে শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু চমরী
গাই, যাদের গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে চড়তে ছেড়ে দেয় গ্রামবাসীরা। নিজের মনে চলতে চলতে হঠাৎ দেখি
সামনে একটা বেশ বড়ো পাহাড়। কিছুতেই মনে পড়লো না কি বলেছিলো গ্রামের লোকের - বাঁ দিক
না ডান দিক। ডান দিকে দূরে অনেক গুলো হিমবাহ দেখা যাচ্ছিলো। মনে হলো পাহাড় দুদিক তো
একসময় মিলবে - ডান দিকেই যাওয়া যাক।
ছবি তুলতে তুলতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলো। জল প্রায় শেষ। এতো ওপরে ছোট ছোট নদী
থাকে, কিন্তু জানতে হয় কোথায় আছে। ওরা বলেছিল ৬ ঘন্টায় কমিক পাবো কিন্তু ৭ ঘন্টা পরেও
পাহাড়ের মাঝে কোনো জনবসতি পেলাম না।



Demul village nestled among the lofty mountains - Padmanava Sen

দূরে দেখি একজন স্নানীয় মেয়ে বসে আছে। এতোক্ষণ পরে কাউকে দেখে কি যে ভালো লাগলো বলে বোঝানো যাবে না। পাহাড়ের ধারে বসে ছিল চুপটি করে। আমি দূর থেকেই হ্যালো হ্যালো করতে করতে গেলাম। ২৫-২৬ বছরের হবে। আমাকে দেখে যেন একটু অবাকই হলো। স্পিতির ভাষা ভোটি যেটা অনেকটা তিব্বতি ভাষার মতো। তবে সবাই হিন্দি বুঝতে বা বলতে পারে। আমি হিন্দিতেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে কমিক যাবো কি করে। কেমন যেন বিষন্ন হয়ে গেলো ওর মুখটা, বললো দেখিয়ে দেবো। যা হয় একজন সাথে থাকলে, অচেনা পাহাড়েও অনেকটা সাহস ফিরে এলো। পাহাড়ি মেয়েরা খুব সহজ সরল হয়। কথা বলতেও ভালো লাগে।

কমিক যাওয়া উঠলো মাথায়। পাহাড়ের ধারে বসে গল্পেই এক ঘন্টা পেরিয়ে গেলো। জানতে পারলাম ওর নাম মনি। ও একাই পাহাড়ে ঘুরতে ভালোবাসে। ছোট বেলা থেকেই জ্বালানির জন্যে গ্রাম থেকে দূরে যেতে হতো। আস্তে আস্তে এখন পাহাড় ওর ভীষণ আপন হয়ে গেছে। বাবা মা ওকে ছেড়েও দিয়েছে। সাথে একটা বড়ো জলের বোতল, কম্বল আর কিছু শুকনো খাবার নিয়ে বেরিয়ে পরে ২-৩ দিনের জন্যে। আমার ভাবতেই অবাক লাগছিলো।

হঠাৎ খেয়াল হলো সূর্যাস্তর বেশি দেরি নেই। জিজ্ঞেস করতে বললো যে কমিক গ্রাম আরো ৫ ঘন্টা দূরে, আজকে যাওয়া যাবে না। কিছুটা দুঃখ হলো কিছুটা আবার আনন্দ। সাথে এমন সাহসী কেউ থাকলে ভয় किसের আমার, সে যত অচেনা পাহাড় ই হোক। কিন্তু রাতে ঠান্ডায় কি হবে! মনি বললো ভয় নেই গ্রামের লোকেরা দূরে দূরে ছোট ছোট ঘর করে রাখে যদি জ্বালানি তুলতে দেরি হয়ে যায় বা তুষারপাত থেকে বাঁচবার জন্যে।

৩০ মিনিট ওর সাথে হাটতেই দেখা গেলো একটা ওরকম ঘর। ঘর না বলে চারটে দেওয়াল বলাই ভালো। একটু কোনার দিকে ছাদের মতো করা। তার বাইরে পাথরে বসে পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখলাম। ছোট্ট একটা নদী ১০ মিনিট হাটা পথে ছিল। বোতলটা ভরে নিয়ে এলাম। তারপর শুরু হলো গল্প। আমি তো এমনিতেই গল্পবাজ। মনি কখনো স্পিতি উপত্যকার বাইরে যায়নি। কমিকে যেটুকু লোক আসে তার থেকে ভাঙ্গিস হিন্দিটা শিখেছিল। ওকে কত কথা বললাম - কলকাতার কথা, আমার ছোটবেলা, আমার গবেষণা, আমার বেড়ানো, হিমালয়কে ভালোবেসে ফেলা। ও ওদের গ্রামের কথা বললো, যারা ট্রেকিং করতে আসে তাদের কথা, শীতকালে ওদের বিভিন্ন উৎসবের কথা। ঘরের একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে আর আকাশে মিল্কিওয়ে র তারা গুনতে গুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুজতেও পারিনি।

সুন্দর সকালে উঠে প্রথমে মনে হলো কমিক পৌঁছে যাবো কিছুক্ষনের মধ্যেই। হাটতে হাটতে মনে হচ্ছিলো মনি না থাকলে কি হতো - হয়তো রাতে জলের অভাবে আর ঠান্ডায় কোথাও হাইপোথারমিয়া হয়ে মরে যেতাম। আরেকটা ইচ্ছে হলো। একদিনেই যদি ওকে এতো কাছের মানুষ মনে হয় তাহলে সাহস করে বলবো কি, আমার সাথে এক মাস ঘুরতে।

স্পিতি র বাইরেও কত পাহাড়, কত নদী, কত রঙ্গিন শহর আছে দেখার মতো। হয়তো মানালিতে গিয়ে ও ট্রেকিং কোম্পানিতে গাইডও হতে পারবে, বলেই ফেললাম হাটতে হাটতে। তখন দূর থেকে গ্রাম দেখা যাচ্ছে - সেই কমিক গ্রাম। সেই দৃশ্য দেখা মাত্র ওর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেলো। ওকে দেখে আমিও একটু বেশিই খুশি হয়ে গেলাম। এই কি ভালোবাসার প্রথম লক্ষণ? তারপরে নিজেকেই

ধমকে উঠলাম মনে মনে- বেশি সিনেমা দেখলে যা হয় । অত না ভেবে এগোতে থাকলাম। দূর থেকে একজনকে দেখতে পেলাম গ্রামের সীমানায় - একজন বৃদ্ধ মানুষ। দেখে হঠাৎ মনি কিরকম দমে গেলো। আমার হাতটা ধরতেই দেখলুম ভীষণ ঠান্ডা। বিষন্ন চোখে তাকালো আমার দিকে, তারপরে পাহাড়ের অন্তরালে হারিয়ে গেলো - মনটা কেঁদে উঠলো অকারণে।

সেই স্থানীয় বৃদ্ধ কাছে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন আমার সাথে কে ছিল একটু আগে। মনির নাম করতেই বৃদ্ধ অকাতরে কেঁদে উঠলেন। একটু শান্ত হতে জানতে পারলাম তাদের ডাকাবুকো মেয়ে মনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতো। ১০ বছর আগে এক অক্টোবরের তুষার পাতে হারিয়ে যায়। তার ৩ দিন পরে তাকে হাইপোথারমিয়া তে মৃত পাওয়া যায় ৪ ঘন্টা দূরে।

এর পর আমার আর কিছু বলার ছিল না। মনি এখনো আমার মতো হারিয়ে যাওয়া মানুষদের বাঁচিয়ে যাচ্ছে।

অনেক দিন কেটে গেছে। এখনো যখন পাহাড়ের পথে হারিয়ে যাই বা জার্মানির জঙ্গলে পথ খুঁজে পাই না, মনে হয় মনি কাছেই আছে, আমার সেই প্রিয় বন্ধু , আমার সেই প্রিয়জন যাকে আর আমার স্পিতি উপত্যকার বাইরে কিছু দেখানো হলো না। বা হয়তো সে আমার সাথেই আছে, পৃথিবী ভ্রমণ করছে সবার অজান্তে।



Frail hands reaching for the sky
Saxony Switzerland - Writam Banerjee

শুভ্রো প্রেম

চন্দ্রাধিশ ঘোষ

"যদি জানো মোর রন্ধনের প্রণালী
তবেই তুমি প্রকৃত বাঙালি"
এত বলি শুভ্রো চলে গেল মুখে,
চোখ দুটো বুজে ফেলিতৃপ্তির সুখে।
নারকেল কোড়া হয়, আদা হয় বাটা,
গরম তেলে পড়ে যায় দুটি তেজ পাতা।
উচ্ছে দুটি উঁকি মারে বেগুনের পাশে,
চারটে ভাজা বড়ি যেন আনন্দে ভাসে।
হলুদ দুখে সাঁতার কাটে তিন টুকরো ডাঁটা,
ঘী বলে আমাকেও ফেলো পাঁচ-ছ ফোঁটা।
পাঁচফোরন ঝগড়া করে রাধুনির সাথে,
আলু, পোস্ট আলাদা হয়েও থাকলো আজ পাতে।
কলা বলে "আমাকে দিল না কেউ পাকতে,
কেটে কেটে ফেলে দিল গরম তেলের কড়াতে।"
ডুবে ডুবে জল খায় সিম চারখানা,
সরষে ছিল বাটা হয়ে দাপট ষোলো আনা।
নুন ছিল, চিনি ছিল,ছিল রাঙাআলু,
আর ছিল "বাসা" এক, যার নাম "ভালো"।



Dinesh Bera (6 yrs)



Fantasy Land - Araf Rahman (13 yrs)



Serenity- Koushiki Chattopadhyay

একটি অন্য প্রেমের গল্প

শূন্য

"আজ যেমন করে চাইছে আকাশ তেমনি করে চাও গো..." ---

'আবার সাত সন্ধ্যা বেলা থেকে গানের ধুম পড়েছে! কোন কাজ নেই ... সারাদিন অখন্ড অবসর ... তাই আদিখ্যেতা দেখো!' - মনে মনে গজরাতে গজরাতে চায়ের জলটা চাপালো রূপা। ওর এখন অনেক কাজ - চা করো, জলখাবারের যোগান দাও, টিফিন করো, বিট্টুকে ঠেলে স্কুলে পাঠাও - কাজের অভাব নেই। তারপর তো নিজেকেও বেরোতে হবে। আজ অফিসে বড় একটা মিটিং আছে - নতুন বস আসবে। মিটিং এর ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে রূপা চা-টা বানিয়ে ফেলে, কোনরকম একটা চুমুক দিয়েই - " বিট্টু! এই বিট্টু!" - বলে একটা হুংকার দিল। পরমুহূর্তেই চা ফেলে সে ছুটল বিট্টুর ঘরে। 'ছেলেটা জ্বালিয়ে শেষ করে দিল। রোজ সকালে এই এক নাটক।' - ভাবতে ভাবতে সে বিট্টুর ঘরে ঢুকেই ওর গা থেকে এক টানে চাদরটা সরিয়ে দিল। "এইযে মহারাজ! আপনি উঠে আমায় ধন্য করুন! দাঁতটা মেজে, স্নান করে, ব্রেকফাস্ট করে স্কুলে যান! উঠুন!" বিট্টু চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে এক বলক মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখে নিল। সে বুঝলো আজ ঝামেলা করলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে। তাই সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। রূপা বিছানাটা ঠিক করতে করতে মনে মনে একবার প্রেজেন্টেশন টা আওড়াতে লাগলো।

আহা! দেখেছেন! এতক্ষণ ধরে রূপা আর বিট্টুর সকালের রোজনাচা আপনাদের শুনিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওদের সাথে পরিচয়টাই করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার এই ভুলের জন্যে ক্ষমা করবেন। রূপা ও বিট্টু - মা ও ছেলে। রূপার বয়স ৩৮; কলকাতার এক বহুজাতিক বেসরকারি কোম্পানিতে ম্যানেজারের পদে কর্মরতা, সিঙ্গেল মাদার। বিট্টুর বাবা রুদ্রর সাথে তার পরিচয় কলেজে। তারপর পাঁচ বছর চুটিয়ে প্রেম এবং লিভ-টুগেদার। যেদিন সে জানতে পারল যে তাদের জীবনে বিট্টু আসতে চলেছে, সেদিনই সে আরেকটা খবরও পেয়েছিল - কার এক্সিডেন্টে রুদ্র আর নেই। সেই থেকে তার একার সংগ্রাম। বাবা-মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন - সেই কলেজে থাকতে। রুদ্রর মা বেঁচে আছেন, কিন্তু তার মতো 'বাজে মেয়ের' সাথে সম্পর্ক রাখতে চান না - তা রুদ্রর শ্রাদ্ধের দিনই জানিয়ে দিয়েছেন। এও বলেছেন যে বিট্টু তার কেউ হয় না। তাই মা ও ছেলে - শুধুই দুজনকে নিয়ে এই সংসার। এছাড়াও রূপার প্রবল আত্মসম্মান বোধ, তাকে কখনো কারোর কাছে মাথা নত করতে দেয়নি, তাই সে একাই লড়ে গেছে। বিট্টু এখন ১০, ক্লাস ফাইভের ছাত্র। পড়াশোনায় ভালো আর তার সাথে ভালো ফুটবলও খেলে।

কি বললেন? রূপা-বিট্টুর কথা শুনলেন - আমি কে? আরে! সবে তো গল্পের শুরু - অপেক্ষা করুন, সব জানতে পারবেন। তা রূপা আর বিট্টুর গল্পে ফেরা যাক। যতক্ষণে আপনারদের বিট্টু আর রূপার পরিচয় দিচ্ছিলাম, ততক্ষণে বিট্টু বাবুর স্নান করে ইউনিফর্ম পরা হয়ে গেছে - ও এখন ব্রেকফাস্ট করছে। রূপা চায়ের কাপটা মাইক্রোভেনে গরম করতে দিয়ে বিট্টুর টিফিনটা প্যাক করে ফেলল। টিফিনের সব খাবার যেন শেষ হয়..." - কড়া গলায় বিট্টু কে জানিয়ে দিল রূপা। তারপর বিট্টুকে 'সি অফ' করে একটু এসে বসলো। এটাই ওর 'ফিফটিন মিনিটস অফ রেস্ট' - নিজের জন্য কষ্ট করে বের

করে নেওয়া সময়। এই সময়টা রূপা খুব উপভোগ করে - বিপুল দৈনন্দিন জীবন সমুদ্রের মাঝে এ যেন এক অপূর্ব ব্যক্তিগত দ্বীপ। এইটুকু সময় শুধুমাত্র ওর নিজের - এর পরেই রেডি হয়ে অফিসে বেরিয়ে যেতে হবে। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসে গান - এখন বদলে গেছে - এখন বাজছে - 'সে চলে গেল বলে গেল না, সে কোথায় গেল ফিরে এল না।' সকালের বিরক্তির বদলে এবার রূপার মনে ভিড় করে এলো এক ঝাক স্মৃতি। রুদ্রর কথা মনে পড়ল। এই গানটা তার খুব প্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে আন্ডার জুড়ে দিত - "এই রূপস। ওই না বলে চলে যাওয়ার গানটা কর না।" 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' - এই নামটা ওর কখনোই মনে থাকতো না। আর সেই যখন গেল তখন তো না বলেই চলে গেল!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপা উঠে পড়ল। দ্বীপ ছেড়ে আবার সমুদ্রে ভাসার পালা। মনে মনে আবার শুরু করল 'গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু টুডেস প্রেজেন্টেশন...'

চলুন, রূপাকে একটু একা ছাড়ি - ও তৈরি হয়ে অফিস যাক - তবেই না আমাদের গল্পের গাড়ি এগোবে। ততক্ষণে চলুন, আমরা আর একজনের মনের ভেতর একটু উঁকি মেরে আসি। আদিত্য আজ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত। আজ নতুন অফিসে যোগ দেবে ও, সি ই ও হিসেবে। সকাল বেলা, তাই প্রথমেই সব ম্যানেজারদের সাথে একটা বড় মিটিং রেখেছে। অনেকদিন পর নিজের শহরে ফিরেছে আদিত্য। কলেজের পর, সেই যে কলকাতা ছেড়েছিল, আজ দীর্ঘ ১৫ বছর পর আবার ফিরলো সে। শহরটা তার কাছে একদিকে যেমন চেনা অন্যদিকে তেমনি অচেনা। আজ তাই দেরী করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হতে, হঠাৎ ওর মনে হল ওকে 'আদি' বলে আর কেউ ডাকে না। মা বাবা ছাড়া আর দুজন মাত্র এই নামে তাকে ডাকত। তবে সেসব অতীত - মা-বাবাও নেই, আর বাকি দুজনের খোঁজ সে জানে না।

এই গল্পের অন্য কুশীলবের এক ঝলক পেয়ে গেলেন তাহলে! এবার চলুন রূপার কাছে ফেরা যাক। সে এতক্ষণে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে অফিসের পথে। অফিসে পৌঁছে, তাড়াতাড়ি একবার কনফারেন্স রুমে চোখ বুলিয়ে নিল - যাক সবকিছু ঠিকঠাক। খুশি হয়ে রূপা তার ক্যাবিনে চলে গেলো প্রেজেন্টেশনটা আরেকবার ঝালিয়ে নিতে। এর পর এক ঘণ্টা এগিয়ে যাই চলুন। এর মধ্যে তেমন কিছু ঘটেনি, তাই একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করলাম আরকি! না হলে আপনারা বলবেন ছেলোটো গল্প নয় মেগা সিরিয়াল-এর প্লট শোনাচ্ছে।

এখন ১০:৫০ - ঠিক ১১-টায় শুরু হবে মিটিং। রূপা ও অফিসের অন্য ম্যানেজাররা অপেক্ষা করছে ওদের নতুন সি ই ও - মিস্টার রায়চৌধুরীর জন্য। তিনি এম্ফুনি এসে পড়বেন। সবাই একটু নার্ভাস - কেমন হবেন মানুষটি কে জানে? অল্প ভয় করাটা স্বাভাবিক। রূপা ভেতরে টেনশন করলেও বাইরে তা দেখালো না।

ঠিক ১১-টায় কনফারেন্স রুমের দরজা ঠেলে ঢুকলেন মিস্টার রায়চৌধুরী। সবাই তাকে অভ্যর্থনা করলেও রূপা কিন্তু পাথর হয়ে রইল। এ কাকে দেখছে সে! আদি! আদির ভাল নাম যে আদিত্য রায়চৌধুরী, ভুলেই গিয়েছিল সে। আদি তাদের নতুন সি ই ও ?! কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে 'হ্যালো স্যার' টা বলেই ফেলল সে। মুখে না প্রকাশ করলেও, এতদিন পর আদিকে দেখে মনের ভেতরে প্রায় একটা সুনামি বয়ে যেতে লাগলো।

- কি বললেন? এরপর কি হলো? এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আদিত্যকে 'আদি' বলে ডাকার দুজনের মধ্যে রূপা একজন। প্রশ্ন হলো - তাহলে অন্যজনটা কে? দাঁড়ান, আগে আদিত্য ওরফে 'আদির' অভিব্যক্তটা বলি - তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

কনফারেন্স রুমে ঢুকে আদিত্যের অবস্থাটাও তথৈবচ। তারও মনের ভেতর তোলপার অবস্থা। 'রূপা! রুদ্রর রূপা! যাকে ভোলার জন্য সে এতদিন শহর ছাড়া, আজ এত বছর পরে সেই রূপা তার মুখোমুখি!' তার হঠাৎ খেয়াল হল যে বাকি ম্যানেজাররা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু সামলে নিয়ে সে বলল "Thank you for your warm welcome. Shall we start the meeting?"

ওরা তাহলে মিটিংটা করুক। আমি আর আপনি সেই সুযোগে না হয় একটু অতীতের থেকে ঘুরে আসি। আপনাদের promise করেছিলাম না যে সব প্রশ্নের উত্তর দেব - তাই এই ফ্ল্যাশব্যাক এর আয়োজন। চলুন, let's go!

আদিত্য রায়চৌধুরী আর রুদ্রনারায়ণ দে - আদি আর রুদ্র, সেই ছোটবেলাকার বন্ধু। সবকিছুই তাদের একসাথে - বড় হওয়া, স্কুলে যাওয়া, প্রথম সিগারেট থেকে কলেজ -সবই। প্রেমেও পড়েছিল একসাথে, শুধু একটা ছোট্ট অসুবিধা ছিল। দুজনেই প্রেমে পড়েছিল একই মেয়ের সাথে।

কে? একটু guess করুন না! - ঠিকই ধরেছেন - রূপা। আদি যখন বুঝতে পেরেছিল যে রূপা রুদ্রকে ভালোবাসে তখন সে ভালো বন্ধুর মতো সরে এসেছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মনের occupied অবস্থাটা vacant এ বদলাতে পারেনি। আজ পর্যন্ত সেটা একই অবস্থায় রয়ে গেছে। রূপাকে ভুলে যাওয়ার প্রচেষ্টায় তাই সে কলেজ শেষ করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শহর ছাড়ে। তারপর আর তেমন যোগাযোগও রাখেনি যাতে রূপার প্রতি তার ভালোবাসা ভুলেও কখনো প্রকাশ্যে না এসে পড়ে।

বুঝলেন তো - কেসটা একটু জটিল। চলুন, এবার আবার বর্তমানে ফিরি। মিটিং শেষ। সবাই বেরিয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু আদি আর রূপা। দুজনেই চুপ। আদি-ই প্রথমে নিঃশব্দতা ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "তোর খবর কি? রুদ্র কেমন আছে?"

এই একটি সরল প্রশ্নে রূপার এতদিনের চেপে রাখা দুঃখের বাঁধ ভেঙে পড়ল। সে হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। এর আগে সে কারোর সামনে কোনদিনও কাঁদেনি। কিন্তু আজ সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সেই কান্নার মধ্যেই রূপা বলে উঠল "ও আর নেই! তোমায় খবর... Contact... এতদিন ..."। এই কটা অস্পষ্ট কথার পর আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

কিছুক্ষণ সময় লাগলো আদির ব্যাপারটা বুঝতে। যখন সম্বিত ফিরে পেলো, তখন তার মনটাও হুহু করে উঠলো রুদ্রর জন্যে। তারপর সে তাড়াতাড়ি উঠে রূপার পাশের চেয়ারে বসলো। আদি হঠাৎ লক্ষ্য করল তার সামনে একটা টিস্যুর বাক্স রয়েছে। সে কয়েকটা টিস্যু বার করে রূপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কাঁদিস না। আমি এসে গেছি। আমায় সব বল। কাঁদিস না। আমি আছি তো।" রূপা কিছু বলল না, শুধু আদির হাতটা ধরে কেঁদে চলল। আর আদি ওকে শান্ত করার চেষ্টা।

এই যে! চলে আসুন! ওদের ছেড়ে দিন। ওদের এখন ১৫ বছরের গল্প বাকি আছে - করতে দিন। বিটুর ব্যাপারেও তো আদি জানে না, তাও জানবে আস্তে আস্তে। রূপা কে সাপোর্ট করার লোক এসে গেছে। ওই যে শুনলেন না - আদি বলল, 'আমি আছি তো'। এবার তাহলে আমার কাজ শেষ, আমিও তাহলে চলি। অনেক খাটনি গেছে আমার এইসবের আয়োজন করতে। আদির চোখে যাতে এই কম্পানির অফার লেটারটাই বেশী চোখে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, টিস্যুর বাক্সটা যাতে হাতের

কাছে থাকে - সেটাও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। এছাড়া পাশের বাড়ির গানের সিলেকশন, আরো কত কী! সব যখন ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে, এবার আমার ছুটি! তাহলে আমি আসি? কী বললেন? ও আমার পরিচয়টা বাকি? হ্যাঁ, তাই তো! সরি সরি! আমার আগে একটা নাম ছিল, এখন নেই! এখন একটা যা খুশি দিয়ে দেবেন। কিছু বলে ডাকলেই হল - না ডাকলেও ক্ষতি নেই। আমার আরেকটা পরিচয় আছে - আমি রূপাকে অসম্ভব ভালোবাসি। কী? আমার আগের নাম? - রত্ননারায়ণ দে। আমি এবার আসি তাহলে, ভালো থাকবেন!



সমাধান

অ	ধি	বা	স		ন	ব	প	ত্রি	কা		গ	ণে	শ		
কা			ক্ষি					ন			জা			চা	
ল			পু	রো	হি	ত		য়			জ	বা	ফু	ল	
বো			জো			প		ন		রো	ল			চ	
ধ	ক	ল		আ	ধ্বি	ণ								কা	শ
ন				জ্জা			ফ	স	ল						র
	অ			প্যা	ন্ডে	ল			আ						ণা
ম	হি	ষা	শ্র	র				পূ	জা	বা	ধি	কী			গ
হা			ড		লু	চি				র					ত
ল	হ	মা		জাঁ		ৎ		দ্বা							
য়া			ঢা	ক		কা	স	র					চা	মু	ন্ডা
	শা					র		ঘ	টি	গ	র	ম			
	স্তি		আ	ল্ল	না		প	ট		র		র	মা		
	জ		ল				টু		ক	দ	মা				
বে	ল	পা	তা		বি	জ	য়া				লা	ল	সু	তো	

